কেশব দাশ

পবিত্রতার অদল বদল

মনীষা

প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭-র পক্ষে
রমেন দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

কথা-সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

ক্র ম

সংকেত

১.

দু-নম্বর গেট দিয়ে কারখানায় ঢুকেই খবরটা শোনেন ব্রজ সেন, কাল এক নম্বর গেটে ঠিকা শ্রমিকদের সঙ্গে বেশ একটা জবরদস্ত গণ্ডগোল হয়েছে—ভাঙচুরও হয়েছে কিছু।

বেলা এগারোটার সময় ইউনিয়নের সম্পাদক রথিন হাজরা ফোন করেন, 'সেন, শুনেছেন ব্যাপারটা, কনট্রাক্ট লেবারদের—সিরিয়াস। আজ মিটিং ডাকছি, তিনটেয়. রিক্রিয়েশন রুমে—আপনার আপত্তি নেই তো ?' 'না না ডেকে দাও ..'

টিফিনের পর বেলা একটার সময় হাতের কাজ মোটামুটি সেরে ব্রজ সেন বেরিয়ে পড়েন। পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য কারখানার সেডের ভেতর দিয়ে হাঁটা দেন। নিজের ডিপার্টমেণ্ট অতিক্রম করে ঢোকেন মেলটিং শপে। এখানে বিশাল সেডের মাঝখানে দুটি প্রকাণ্ড ফার্নেসের ভেতর থেকে অবিরাম নির্গত গলিত লৌহস্রাব ডাইসে আদল পেয়ে কনভেয়ার বেল্ট হয়ে চলে যাচ্ছে রোলিং মিলে। ফার্নেসের উত্তাপে এখানকার বাতাস সর্বদা গরম এবং বিচিত্র শব্দমালায়—ফার্নেসের শব্দ, কয়েক শত হর্স পাওয়ারে চালিত কনভেয়ার বেল্টের চাকাগুলির ঘরঘরানি এবং আরো বিবিধ যান্ত্রিক শব্দে এখানকার পরিমণ্ডল ভার হয়ে আছে। সেডের গা-ঘেঁষে

আপার ডেকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে ব্রজ সেন দূরে ফার্নেসের হাঁ-করা অগ্নিকুণ্ডে, যেখান থেকে লোহিত লৌহস্রাব বেরিয়ে আসছে, সেদিকে তাকান—চোখ যেন ঝলসে যায় উত্তাপ আর গলা লোহার আলোকছটায়।

মেলটিং শপ পার হয়ে ঢোকেন স্টোরে। দু পাশে থাকে থাকে সাজানো দীর্ঘ লোহার বারগুলি, মাঝখানে সরু প্যাসেজটা দিয়ে হেঁটে যান। সেডের চালার নিচে আড়াআড়িভাবে ঝুলন্ত ওভার হেড ক্রেনটা ব্রজ সেনের মাথার ওপর এসে থেমে যায়। ড্রাইভার কেবিনের জানালা থেকে একটা মুখ নিচে ঝুঁকে পড়ে। 'সেনদা, দাঁড়ান এক মিনিট—' বলেই কেবিনের দরজা খুলে একটা মানুষ ঝুলন্ত মই বেয়ে নেমে আসে নিচে। মানুষটিকে চেনেন ব্রজ সেন—দুলাল মণ্ডল, যুবক, ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী। যুবকটি ওর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'সেনদা, ওই কেসটা কি হল?' 'কোন কেসটা বলত?' 'ঐ যে মেণ্টেনেন্সের—ফোর ফর্টিতে শক খেয়ে—লোকটা আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার ছিল, ওর ওয়াইফ এসেছিল আজকেও—কেসটা তো কিছু করতে হয়!' 'ওঃ ঐটা, নাসিরউদ্দীন না কি নাম যেন—ঐ কেসটা তো! আরে ভাই, ব্যাপারটা নিয়ে তো আমি ডিপার্টমেণ্টাল ম্যানেজার খান্নার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, এক্সিডেণ্ট, বেনিফিট মিলিয়ে ওর পাওনা দাম-সাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার হবে। কিন্তু টাকাটা পাবে কে?' 'কেন, 'ওর বৌ।' 'ওর বৌ তো তিনটে, কোনটা পাবে?' 'নাসিরউদ্দীন মারা যাবার আগে থার্ড ওয়াইফের সঙ্গে ঘর করত, সে দিক থেকে—' 'সে বললে তো হবে না। আগের দুটো বৌও কোম্পানির কাছে অ্যাপিল করেছে। আর তাছাড়া নাসিরউদ্দীন আগের দুটোকে ফর্মাল ডিভোর্সও করে নি। সুতরাং এখন আইনের প্যাঁচে—বুঝলে তো। কোম্পানি এখন কাকে লিগাল ওয়াইফ বলে মেনে

নেবে।' 'তাহলে কি করা যায় সেনদা?' 'কিছু একটা করতে হবে। ফর নাথিং টাকাগুলো তো আর কোম্পানির ক্যাপিটাল হয়ে যেতে পারে না। দেখা যাক।' 'দেখবেন সেনদা ব্যাপারটা—' বলে যুবকটি আবার মই বেয়ে ওপরে উঠে নিজের কেবিনে ঢোকে।

স্টোর অতিক্রম করতেই সামনে কারখানার এক নম্বর গেট সংলগ্ন বিশাল চত্বর। চত্বরের মাঝখানে ডেসপ্যাচের অপ্রশস্ত চৌকাণা বুথ, ও প্রান্তে রিসেপশন। ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মে যারা এখানে আসেন, প্রথম চোটেই তাদের মনে যাতে কোম্পানির আভিজাত্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যায়, তার জন্য রিসেপশন রুমটি অত্যন্ত সজ্জিত ও পারিপাটি—সম্মুখে পাশাপাশি পার্কিং প্লেস, এক টুকরো সবুজ ঘাসের লন এবং তার মধ্যস্থলে জলের ফোয়ারা বুকে নিয়ে শ্বেত পাথরে বাঁধানো ছোট্ট একটি জলাধার।

রিসেপশনের সামনে প্রায় দশ বাই সাত ফুট কাচের দেয়াল, যার বাধাহীন স্বচ্ছতা ভেদ করে অন্তর্ভাগ দৃশ্যমান: মেঝেয় রঙিন ফরাশ, বিপরীত দেয়ালের গা-ঘেঁষে কয়েকটি সোফা সেট এবং তার সামনে একটি অনুচ্চ টেবিলে দেশী-বিদেশী কয়েকটি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগাজিন, দেয়ালের গায়ে কারখানায় তৈরি সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রডাক্টের ফ্রেমে আঁটা মডেল।

এখন সেই রিসেপশন রুমটির লণ্ডভণ্ড ছত্রাকার অবস্থা—কাচের দেয়াল ভেঙে টুকরো টুকরো, ভেতরে সোফা সেট, টেবিল, ম্যাগাজিনের পাতা ইত্যাদি এলোমেলো ছড়ানো, দেয়াল ও দেয়ালের গায়ে ছবিগুলিতে কাদা লেপানো…

'সেন যে, কি খবর, ইনভেস্টিগেশনে এসেছ—ভালো!' সেন বাঁয়ে ঘাড় কাত করেন—নিখিল দত্ত। '…আরে ভাই তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না, এদিকে আসোই না একেবারে, চলো আমার অফিসে—' বলে নিখিল দত্ত ডেসপ্যাচ সেকশনে

নিজের চেম্বারে জোর করে টেনে নিয়ে যান ব্রজ সেনকে। একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে নিখিল দত্তর বিপরীতে, মুখোমুখি বসেন ব্রজ সেন।

ব্রজ সেন এবং নিখিল দত্ত প্রায় একই সঙ্গে এম আর সি কারখানায় ঢুকেছিলেন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে। তারপর পদোন্নতি হতে হতে নিখিল দত্ত এখন একটা ডিপার্টমেণ্টাল সুপারভাইজার।

'অবস্থাটা দেখলে তো সেন' নিখিল দত্ত বলেন, 'কনট্রাক্ট লেবার, ক্যাজুয়াল লেবারে কারখানা ছেয়ে যাচ্ছে। আর প্রত্যেকদিন ঝুট ঝামেলা মারপিট…'

'কি হয়েছিল?'

'আরে ভাই, আর বল কেন…বেকার ছেলেগুলোকে সারাদিন খাটাবি, দিবি তো ছ-সাত টাকা রোজ, তাও পেমেণ্ট নিয়ে ধানাই-পানাই, আজ নয় কাল। তা ওরা সেসব শুনবে কেন, বল। এই নিয়ে গণ্ডগোল বচসা। তারপর কোম্পানির সিকিউরিটি ফোর্স বোধ হয় সরিয়ে দিতে গেছিল, ব্যস হিতে বিপরীত, ভাঙচুর এইসব—'

'কোন কনট্রাক্ট মালিকের সঙ্গে গণ্ডগোলটা হল?'

'ঐ যে সিংজী, ওর পে-মাস্টারের সঙ্গে। সিং-ই তো এখন লর্ড'

সিংজী, অর্থাৎ প্রেমজিৎ সিং, অর্থাৎ—

ব্রজ সেনের চোখের সামনে একটা আসুরিক চেহারা ভেসে ওঠে —গাল ভর্তি চর্বণরত পানের সঙ্গে শক্ত দুটি চোয়ালের ওঠানামা, এক জোড়া মোটা দীর্ঘ গোঁফ চিবুকের দুই প্রান্ত পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং মুখের হাসি ও চোখের দৃষ্টিতে এক রকম অর্থপূর্ণ ধূর্তামি।

সিংজী—অর্থাৎ সেই ব্যক্তিটি, ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য নয়, একজন সাধারণ শ্রমিকও নয়, মায় কোম্পানির দশ টাকার একটা

শেয়ার হোল্ডারও নয়, তবু তার জিপটি যখন বেপরোয়া গতিতে কারখানার গেট অতিক্রম করে, তখন গেটের দারোয়ান ত্বরিত তৎপরতায় গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে ঠকাস করে সেলাম ঠোকে।

সিংজীকে ব্রজ সেন চেনেন, ভালো ভাবেই। উত্তর প্রদেশের জাঠ বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তিটি যৌবনকালে একদা হাওড়ার এই শিল্পাঞ্চলে এসে উঠেছিলেন সুদের ব্যবসা করতে। এম আর সি তখন এত বড় ছিল না, এত শ্রমিক কাজ করত না। সপ্তাহান্তে মঙ্গলবার শ্রমিকদের যেদিন বেতন হত, সেদিন ছুটির সময় কারখানার গেটের সামনে সারি দিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকত শ্রমিক-বৌরা আর অন্য দিকে পাওনাদার কুসীদজীবীরা। শ্রমিকদের বৌরা দাঁড়াত যাতে তাদের স্বামী সপ্তাহের টাকাটি চোলাই মদ আর জুয়ার আড্ডায় ঢেলে দিয়ে আসতে না পারে, আর পাওনাদাররা অপেক্ষা করত তাদের খাতকটিকে পাকড়াও করতে। দিগন্ত কাঁপিয়ে কারখানায় ছুটির সাইরেন বাজত, আর ছোট্ট গেটটা দিয়ে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো কালিঝুলি মাখা শ্রমিকরা বেরিয়ে আসত পিল পিল করে। অপেক্ষমান সিংজী মানুষের চলমান স্রোতের মধ্য থেকে হঠাৎ তার প্রার্থিত ব্যক্তিটিকে যথার্থ ঠাওর করে চিলের মতো ছোঁ মেরে টেনে আনত, 'নিকালো রুপেয়া—'

সময়টা তখন বোধ হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি। হুগলী নদীর ওপারে কলকাতা বন্দরে বোমা পড়ল। এপারে নদী-সংলগ্ন অসংখ্য ছোট-বড় কারখানা আর কারখানা-সংলগ্ন শ্রমিক বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ল ত্রাস। 'হায় ভগওয়ান ক্যা হোয়ি।' দলে দলে শ্রমিকরা চাকরি ছাড়ল, চাকরি ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পাড়ি দিল দেহাতে। বস্তি ফাঁকা। বস্তি মালিকরাও বস্তি বেচে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে। এগিয়ে এলো সিংজী। সিংজী বুঝল যুদ্ধ চিরস্থায়ী নয়, সুতরাং

এই মওকা। শ-শ ঝুপড়ি সমতে এক-একটা মহল্লা, মহিষের খাটাল কিনে নিল জলের দরে। সিংজী হিসেবি মানুষ, ঘাঁটঘোঁট বোঝে, ঠিক মতো সুযোগ আসলে ওর হাত ফসকায় না। বস্তি ভাড়া, খাটাল আর ঠিকা ব্যবসা ছাড়া সিংজী এখন দুটো সিনেমা হল এবং বাসের মালিক। আগে চোলাই মদের কারবার ছিল, এখন তুলে দিয়েছে। 'উসমে ঝামেলা বহুত, নাফা কম—' এখন শহরে দুটো বিলাতি মদের দোকান খুলেছে। ইতিহাসের অশ্বারোহী কোন হানাদারের মতো সিংজীর গাড়ি যখন অরোধ্য গতিতে শহরের ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যায়, তখন রাস্তায় লোকমুখে গুঞ্জন ওঠে, 'সিংজী! সিংজী!'

নিখিল দত্ত বলেন, 'আরে ভাই, সেলস, পারচেস, ডিপার্টমেণ্টাল ম্যানেজার সকলে সিংজীর হাতের মুঠোয়। কারখানায় টোটাল কনট্রাক্ট জবের ফিফটি পার্সেণ্ট সিংজীর বাঁধা। তা বলে ভেবো না সব কাজটা সিংজী নিজে করে, বেশির ভাগটাই তুলে দেয় সাব-কনট্রাক্টরের হাতে। ধরো একটা কাজে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেণ্ট, কম করে হলেও, প্রফিট—টেন পার্সেণ্ট সিংজী আর ফিফটিন পার্সেণ্ট সাব-কনট্রাক্টরের। সিংজী শুধু টেণ্ডার ট্রান্সফার করেই খালাস। সবই গুঁড়োর মহিমা সেন। আমাদের পারচেসের কাপুর—প্রত্যেক শনিবার রেস গ্রাউণ্ডের সামনে দাঁড়াবে—দেখবে, সিংজীর সঙ্গে গাড়ি থেকে নামছে। আমি তো ভাবি, কবে হয়ত শুনব সিংজী এম আর সি কারখানাটাই অকসনে ডেকে নিয়েছে।'

দত্ত বেল টেপেন। দরজা ঠেলে বেয়ারা ঢোকে। 'চা খাবে?' দত্ত জিজ্ঞাসা করেন। মৃদু হেসে ব্রজ সেন, 'এতো দিন বাদে এলাম—' 'দো চা লেয়াও।' ড্রয়ার টেনে সিগারেট বের করেন। ব্রজ সেনের দিকে বাড়িয়ে দেন, নিজে একটা নেন। প্যাকেট রাখেন টেবিলে।

'এবারের এম আর সি নিউজ ম্যাগাজিন দেখেছ?' নিখিল দত্ত

বলেন, 'ফ্রাংকফুর্টে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ফেয়ারে এম আর সি প্যাভিলিয়ন, ছবি বেরিয়েছে। এম আর সি-র এখন ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট। মিডিল ইস্ট, আফ্রিকা, এশিয়ার আদার কানট্রিতে বাজার এখন রমরমা। চায়নার মার্কেটে এক্সপোর্ট করার ব্লু-প্রিণ্টও নাকি পাকা। ফরেন আর কমার্স মিনিস্ট্রি থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলেই ব্যস—'

'ভালোই তো। আমরা দেশকে ফরেন এক্সচেঞ্জ কনট্রিবিউট করছি।' হাসতে হাসতে বলেন ব্রজ সেন।

'তা ঠিক। আর ফরেন এক্সচেঞ্জের সুবাদে কোম্পানি সরকারের গুড বুকে আসছে। গভ.মেণ্ট ডিউটি, এক্সপোর্ট ডিউটি ছাড় পাচ্ছে। র' মেটিরিয়েলসে প্রেফারেন্স পাচ্ছে। আর ইণ্টারন্যাল মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে স্রেফ ট্রেড মার্ক আর গুড উইল। ধরো, যে রেলওয়ে অর্ডারে কোম্পানির এতো বাড়বাড়ন্ত, তার সেভেণ্টি ফাইভ পার্সেণ্ট ফিনিসিং জব এখন বাইরের ছোট ছোট ইউনিটগুলোকে দিয়ে করানো হয়। কোম্পানি স্রেফ ট্রেড মার্ক মেরে ছেড়ে দিচ্ছে।'

ডিউটি আওয়ার্সে মিটিং ডাকলে এই একটা সুবিধা, সকলে হাজির হয়। যেমন এখন, ইউনিয়নের নয়জন কর্মকর্তার মধ্যে আটজন উপস্থিত—এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই।

সভার শুরুতে রথিন হাজরা গতকালের ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দেন, '…ব্যাপারটা হল এই, কোম্পানি এখন এসট্যাবলিসমেণ্টের কাজও কনট্রাক্ট দিয়ে করাচ্ছে। সোজা পলিসি, টেণ্ডার কল করো—যত কমেই হোক, কম্পিটিশন মার্কেট, ঠিকাদার ঠিক পাওয়া যাবে। তারপর তারা খাটাক না ছ-সাত টাকা রোজে—নো ওয়ার্ক নো পে—সবকিছুর ঘাটতি হলেও দেশে তো আর বেকারের ঘাটতি নেই…'

ব্রজ সেনের ডান দিকে, জাকির বলেন, 'কারখানায় ঠিকে শ্রমিক কি হারে বাড়ছে সেটা দেখুন—মেশিনশপের তিন নম্বর সেডে ক্রেন থেকে মাল খালাস করার জন্য পাঁচজন লেবার ছিল। দু-জন প্রমোশন নিয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টে চলে যাবার পর কোম্পানি সেখানে নতুন রিক্রুটমেন্ট দেয় নি, দু-জন ঠিকে শ্রমিক নিয়োগ করেছে। লাস্ট ছ-বছরে; আমার মনে হয়, কারখানায় সুইপার, ক্লিনার কমেছে, কিন্তু বাড়ে নি। নতুন যেসব সেড তৈরি হচ্ছে, বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে, সেগুলো পরিষ্কার করার জন্য কনট্রাক্ট দেওয়া হচ্ছে…'

ব্রজ সেনের বাঁয়ে রাজেন সামন্ত বলেন, 'ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু করণীয় কি? কনট্রাক্ট লেবারদের নিয়ে তো কোনো মুভমেণ্ট আশা করা যায় না। তারা আজ আছে কাল নেই '

রথিন হাজরা বলেন, 'এ ক্ষেত্রে করণীয় একটাই, তা হল প্রপার রিক্রুটমেন্টের দাবিতে মুভমেণ্ট গড়ে তোলা…'

সুধীর অধিকারী বলেন, 'কিন্তু আপনি যদি সমস্ত ভ্যাকেন্সিতে প্রপার রিক্রুটমেন্টের দাবি তোলেন, তাহলে হয়ত দেখবেন শ্রমিকরাই আপনার বিরোধিতা করছে। কারণ এটা ইমপ্লিমেন্ট হলে শ্রমিকদের ওভারটাইম বন্ধ হবে—দিস ইজ ফ্যাক্ট! আপনি চাইলেই তো আর শ্রমিকরা মুভমেন্টে নেমে পড়বে না…'

'শোনো, শোনো, ব্যাপারটাকে ওভাবে ভাবলে চলবে না—' ব্রজ সেন বলেন, 'এটাকে একটা সমস্যা হিসাবে ধরতে হবে। এই যে কনট্রাক্ট লেবার, ক্যাজুয়াল লেবারদের নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রিতে একটা নতুন নেগলেকটেড সেমি-ওয়ার্কিং ক্লাস তৈরি হচ্ছে। এরা টোটাল ওয়ার্কিং ক্লাসের বিরুদ্ধেও তো চলে যেতে পারে। আমার কথা হল, এ বিষয়ে ওয়ার্কিং ক্লাসকেই সতর্ক হতে হবে।'

বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনান্তে স্থির হয়, পরে

শ্রমিকদের একটি সাধারণ সভা ডাকা হবে এবং সেখান থেকে কি করা যায় না-যায় সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সভা শেষ হয়, ব্রজ সেন ঘড়ি দেখেন—সাড়ে পাঁচ, অর্থাৎ ছুটির সময় উতরে গেছে, এবার বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া।

রিক্রিয়েশন রুম থেকে বেরোতেই ক্যান্টিন। ব্রজ সেন ক্যান্টিনের বিশাল হলটি আড়াআড়ি অতিক্রম করে বাইরে আসেন। কারখানার চৌহদ্দির অন্তর্গত এ দিকটা আপাতত কারখানার পশ্চাৎভাগ। ডানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রথের দাপটে অতীতের ধোপা পাড়া, বস্তি, দোকান ধূলিসাৎ—অনুচ্চ চড়াই-উৎরাইয়ের মতো শূন্য ধূ ধূ প্রান্তর এবং সেই বিশাল প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাটি ফেলা ট্রাকের খাপছাড়া যাতায়াত, এত দূর থেকে যা দৃশ্যত পিপীলিকার মতো। ক্যান্টিনের বাঁ-হাতি নির্মীয়মান সেডের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা ওয়েল্ডিং-এর চোখ ধাঁধানো ফ্লাস, থেমে থেমে গ্রাইণ্ডিং এবং বোরিং-এর 'ক্রা-আ-আ' শব্দ। নির্মীয়মান সেডটি পার হবেন, ঠিক সে সময় ডাকটা কানে আসে, 'সেনদা—'

ব্রজ সেন দাঁড়িয়ে পড়েন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকান পেছনের দিকে—অ্যাসবেসটাসের উঁচু সারি সারি সেডের গা দিয়ে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে এবং এখান থেকে দৃষ্টির দূরবর্তিগম্যে রাস্তাটা ক্রমশ সরু ও অস্পষ্ট হতে হতে দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে কারখানার শেষ সীমায়। শূন্য রাস্তার ওপর একটা মানুষও চোখে পড়ে না। একটু আগে, ডান দিকে, রাস্তার পাশে উঁচু সারি সারি শাল খুঁটির মাথায় বাঁধা ফ্লাড লাইটের নিচে একটা নতুন সেড নির্মাণের কাজ চলছে। একটি সীমাবদ্ধ পরিসীমায় কয়েকজন মিস্ত্রি আর অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ মাটির ওপর কংক্রিটের স্লাব আর বিম তৈরির কাজে ব্যস্ত। ওদের

কাজ দিবারাত্র, অবিরাম—দিনে উন্মুক্ত সূর্যালোকে, রাত্রে ফ্লাড লাইটে। কর্মব্যস্ত ঐ মানুষগুলোর মধ্য থেকে কেউ ওকে ডাকতে পারে, এমন কোনো ব্যক্তির সন্ধান না-করতে পেরে ব্রজ সেন সামনে হাঁটা দেন। কয়েক পা গেছেন, আবার 'সেনদা—আ—'

ব্রজ সেন এবার ঘাড় উঁচু করে শূন্যে তাকান এবং ওর দৃষ্টি বাঁ-দিকে নির্মীয়মান সেডের চালার ওপর থেকে আকাশের দিকে খাড়া-খাড়ি উঠে যাওয়া চিমনির মাঝখানে এসে স্থির হয়। ব্রজ সেন দেখেন, চিমনির চার দিকে চৌকোণা করে বাঁধা বাঁশের ভারার ওপর দাঁড়িয়ে একটা মানুষ চিমনির গায়ে রঙ লাগাচ্ছে। 'সেনদা চিনতে পারছেন…' শূন্যে ঝুলন্ত মানুষটা চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করে। প্রৌঢ় ব্রজ সেনের দৃষ্টি এমনিতেই এখন একটু ক্ষীয়মান, তারপর মানুষটা যেখানে ঝুলে রয়েছে মাটি থেকে তার দূরত্ব ন্যূনপক্ষে চল্লিশ ফুট এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে আলো-ছায়ায় মানুষটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারেন না। কিন্তু মানুষটা ব্রজ সেনের উত্তরের অপেক্ষা না করে আবার চিৎকার করে বলে, 'চিনতে পারলেন না তো সেনদা, আমি সুখেন্দু, আপনার বাড়ির পাশে…'

ও, সুখেন্দু, সেই ছেলেটা…অনেকটা সে রকমই মনে হচ্ছিল বটে। তবু এতটা উঁচু থেকে ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। আর তাছাড়া ছেলেটাকে এ অবস্থায়, মানে হঠাৎ কারখানার মধ্যে চিমনিতে রঙ লাগাতে দেখবেন, ব্রজ সেনের কাছে অভাবনীয়। ছেলেটাকে চেনেন ব্রজ সেন, যেমন একজন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না-থাকা সত্ত্বেও অনেকবার দেখার মধ্য দিয়ে চেনা হয়ে যায়, সে রকম। অফিসে যাওয়া-আসার পথে ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে ছেলেটা একটু লাজুক হেসে বিনীত স্বরে বলত, 'সেনদা, ভালো আছেন?' প্রত্যুত্তরে ব্রজ সেনকে একটু হেসে সংক্ষেপে সারতে হয়, 'হ্যাঁ ভাই, ভালো আছি।'

কিছুদিন আগে ওর বাবা এসেছিলেন ব্রজ সেনের বাড়ি। বসা

চোখ, বসা গাল, চর্মসার দেহে ঢলঢলে ময়লা পাঞ্জাবি আর কাপড়—খর্বাকৃতি লোকটির মুখের হাবভাবে কেমন যেন সংকোচ ও জড়তা, 'স্যার আইলাম আপনার কাছে একটা দরকারে। আমার পোলাটারে চেনেন তো আপনি, সুখেন্দু। দু-বছর হইল বি-এ পাশ কইরা বইয়া আছে। তাই স্যার আপনার কাছে, আপনে অরে যদি আপনার কারখানায় '

ব্রজ সেন জানেন, এ ক্ষেত্রে সরাসরি পারব না বলে নিরস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়, 'জানেন তো আজকাল আর সে দিন নেই। এখন একটা ভ্যাকেন্সি হলে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, ইণ্টারভিউ নিতে হয়, তারপর চাকরি…'

'আপনে দেখলে হইব স্যার, ঠিক হইব…' বলে গদগদ ভাব প্রকাশ করে তখনকার মতো ব্রজ সেনকে রেহাই দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

তারপর আজ, এখন, মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উর্ধ্বে ঝুলন্ত সুখেনের সঙ্গে ব্রজ সেনের দেখা, 'সুখেন ওখানে কি করছ?'

'কাজ করছি সেনদা—কাজ, কনট্রাক্টরের আণ্ডারে, সাত টাকা রোজ…'

সেই কনট্রাক্টরের আণ্ডারে, কাজ, সাত টাকা রোজ ·· 'সুখেন অত ওপরে কাজ করছ, সেফটি বেল্ট কোথায়?'

শূন্য থেকে একটা হাসির তরঙ্গ ভেসে আসে, 'সেফটি বেল্ট! কাজটা জোগাড় করেছি অনেক কষ্টে, তারপর সেফটি বেল্ট চাইলে এক্ষুণি গেটের বাইরে—বুঝলেন তো!'

আশ্চর্য, এত ওপরে একটা মানুষ কাজ করছে, সেফটি বেল্ট নেই! পড়লে তো সঙ্গে সঙ্গে শেষ, কি ভয়ঙ্কর। এদিকে ডিপার্টে সরকারের লেবার দপ্তর সেফটির ওপর গাদা গাদা পোস্টার সেঁটে দিয়ে যাচ্ছে।

'সুখেন, তুমি কোন কন্‌ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করছ?'

'সিংজীর আণ্ডারে…'

ব্রজ সেনের চোখের সামনে আবার একটা পরিচিত মুখচ্ছবি—একটা আসুরিক চেহারা…এক জোড়া পুরু বিসদৃশ গোঁফ…শক্ত চোয়ালের অবিরাম ওঠানামা নিষ্করুণ দুটি চোখের দৃষ্টিতে ধূর্তামি

এতক্ষণ এক নাগাড়ে শূন্যে তাকিয়ে থাকার জন্য ব্রজ সেনের কপাল টনটন করে। ঘাড় নামিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার ফাঁক দিয়ে চোখ মুছে নেন এবং অতঃপর আবার শূন্যে তাকিয়ে 'সুখেন, সাবধানে কাজ করো' বলে সম্মুখে হাঁটা দেন।

সুখেনকে এ অবস্থায় কাজ করতে দেখে ব্রজ সেনের বাজে লাগে, যতই হোক ছেলেটাকে তো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন। আর তাছাড়া একটা বি-এ পাশ ছেলে, একটা শ্রমিকের কাজও নয়, কন্‌ট্রাক্টরের আণ্ডারে, সাত টাকা রোজ। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকান, দূর থেকে সুখেনের দেহটা দুর্বোধ্য। এমন কি একটা মানবদেহ ব'লেও মনে হয় না, যেন একটা ছোট পুঁটলি চল্লিশ ফুট ওপরে চিমনির গায়ে ঝুলছে। এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ফ্লাড লাইটের আলোয়, রাত্রে, ঐ চিমনির ওপর কাজ করবে নাকি? কে জানে।

কারখানার পেছনের এই সরু রাস্তাটা বাঁ-হাতে সারি সারি নির্মীয়মান সেড এবং ডান হাতে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেখানে বাঁ দিকে মেন গেট বরাবর চলে যাওয়া একটা সুন্দর সুপ্রশস্ত ঢালাই করা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, সেখানে এসে বাঁক নেন। ডানদিকে সেই মেল্টিং শপের সেড এবং সেডের ভেতর থেকে ঠিকরে

বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত ফার্নেসের উদ্‌গার এবং যান্ত্রিক শব্দে এখানকার পরিবেশ ভারি। জায়গাটা পেরিয়ে যাবার আগেই কারখানায় ছড়ানো-ছিটানো হাজার হাজার আলো এক মুহূর্তে টপ করে নিভে যায়, গায়ে গায়ে দাঁড়ানো সেডগুলোর অভ্যন্তরে অসংখ্য যন্ত্রের বিরামহীন চলমানতা স্তব্ধ হয়…লোডশেডিং। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র এলাকা গভীর থেকে গভীরতর নৈঃশব্দে ডুবে যায়। কয়েকটি নির্দিষ্ট আলো জ্বলে। তাতে নিকষ অন্ধকার একটু ঘোচে বটে কিন্তু যন্ত্রের শব্দ ফিরে আসে না। এতক্ষণ যে সমস্ত শ্রমিক আলোর আপেক্ষায় অন্ধকার মেশিনের পাশে হাত গুটিয়ে বসেছিল তারা একে একে বেরিয়ে আসে।

ব্রজ সেন বাড়ি যাওয়ার পথটা সংক্ষিপ্ত করার জন্য মেন গেট দিয়ে না বেরিয়ে পশ্চিমে গঙ্গা নদীর পাড় ধরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ান। ডিজাইনিং সেকশনের বিশাল হল ঘরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সাজানো শূন্য টেবিলগুলোর মাঝখান বরাবর দীর্ঘ প্যাসেজটা অতিক্রম করে ব্রজ সেন বাইরে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনে গঙ্গা নদীর পাড়, ভূগোলে যার নাম হুগলী নদী। এই উঁচু জায়গাটা এমন যে, এখানে দাঁড়িয়ে ডানে-বাঁয়ে তাকালে চোখে পড়ে হাওড়ার বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চল—পাট, সুতা, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অসংখ্য চিমনি শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা। ওপারে কলকাতা—নদীর পাড় ঘেঁষে দীর্ঘ নৌ-বন্দর এবং বন্দরের ওপর জিরাপের গলার মতো অসংখ্য ক্রেন এবং তারও পেছনে খিদিরপুর, বজবজ, হাইড রোড, মেটিয়াবুরুজে শতাব্দীব্যাপী গড়ে ওঠা ছোট-বড়-মাঝারি নানা শিল্প। এই নদী এবং নদী-সংলগ্ন শিল্পাঞ্চল নিয়ে যে বিশাল পরিমণ্ডল, তার বাতাসে সর্বদা ভেসে বেড়ায় লোহা-লক্কড়, হামার, যন্ত্র, জাহাজের সিটি এবং নোঙর ফেলা ইত্যাদির ধাতব ও যান্ত্রিক শব্দ। সন্ধ্যার পর ওপারে বন্দরের অসংখ্য আলোকছটায় নদীর জলে কম্পমান দীঘল

আলোকবিম্ব—যেন দীপাবলীর রাত, যেন নদীর ওপারে ঝলমল চুমকি বসানো একখানা বিশাল কাপড় মেলে ধরেছে কেউ। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবহমান জলস্রোতের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই। সমগ্র তল্লাট নিথর, নিস্তব্ধ এবং গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। এপারে দাঁড়িয়ে ওপারকে দেখা যায় না, উপলব্ধি করা যায় না। এই বিশাল শিল্প নগরীর প্রাণ-ভোমরা যেন হঠাৎ উড়ে গেছে

অন্ধকারে গঙ্গার শান-বাঁধানো ঘাটের দিকে পা বাড়ান ব্রজ সেন।

সুখেন কি এখনো চিমনির গায়ে ঝুলে আছে, অন্ধকারে, সেফটি বেল্ট ছাড়া, চল্লিশ ফুট ওপরে, অন্ধকারে, ঝুলবে, ঝুলতে থাকবে…

অসম্বন্ধ

অবশেষে কারখানাটা খুলল, একটানা পাঁচশ একান্ন দিন তালাবন্ধির পর।

মেশিন শপের তিন নম্বর সেডে ওভার হেড ক্রেনটার নিচে ওরা তিনজন বসেছিল।

মাটি থেকে প্রায় বিশ ফুট ওপরে সেডের দুদিকে রেলের লাইনের মতো লম্বা করে দুটো লোহার পাটি পাতা, আর তার ওপর একটা লোহার স্ট্রাকচার, যেটা চার টন পর্যন্ত মাল শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে সেডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে। কোথায় একটা গণ্ডগোল, আজ কারখানা খোলার তৃতীয় দিনেও ধরতে না পারায়, ক্রেনটা এখনো অচল।

ওরা তিনজন শ্রমিক একটা লোহার স্লাবের ওপর বসে কথা বলছে। বলছে একজন—সুখিয়া কৈরি, শুনছে বাকি সকলে।

'আরে বাই সাঁপ, ও স্টোর মে। কাল ও-লোগ সাফা করনে লাগি তো এক সাঁপ—ইত্তনা বড়া, তড়াক সে নিকাল আয়ি। ওতো শালা কামউম ছোড়কে দৌড়নে লাগি ডরসে। শালা একদম পুরা কাউটা—'

গজু সাহা, ক্রেন ড্রাইভার, ওদের মাথার ওপর অচল ক্রেনের রেলিঙে শরীরের ভার রেখে ওদের কথা শুনছিল। এবার মুখ

খোলে, 'শালা কাউটা—না ?' তলার তিনজন ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকায়।..'শালা' এক্কারে ফোঁস কইরা ঢ্যুইকা যায় নাই ভিতৎতর' বলেই গজু সাহা হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে এমন একটা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে যে সুখিয়া কৈরি ছাড়া সকলে হো হো করে হেসে ওঠে।...'কাউটা ছ্যাখছ হ্যালায় বাপের জম্মে—'

কেউটে বেরিয়েছে, অত্যোক্তি। তবে কারখানার স্টোর যে প্রান্তে, যার একদিকে গঙ্গানদী আর অপর দিকে পুরানো ভাগাড়ের ডাঁই করা ময়লার উর্বর মাটিতে এখন ঘন জঙ্গল, সেখান থেকে সাপখোপ বেরিয়ে স্টোরে মালপত্তরের ফাঁক-ফোকরে যে আশ্রয় নিতে পারে—বিশেষত যখন পাঁচশ একান্ন দিন গোটা কারখানাটা অলস হয়ে পড়ে থাকে—তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে একেবারে কেউটে—সাপের মুখে যে পড়ে তার চোখে সব সাপই কেউটে। তারপর সেটা মুখে মুখে রটনা হতে হতে তো নির্ঘাৎ কেউটেই হয়।

দীর্ঘ তালাবন্ধির পর কারখানাটা যখন খুলল তখন কারখানার ভেতর গোটা তল্লাটে কেমন নিস্তব্ধ ভূতুড়ে চেহারা। ফাঁকা জায়গাগুলোতে রোদ জল পেয়ে গজিয়ে ওঠা ঘাস-গুল্ম, মেশিনগুলোর গায়ে ধুলো বালির পুরু আস্তরণ, যন্ত্রের খাঁজে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট মরিচা। ঢালাই ঘরের উঁচু চিমনিটা, যার মুখ অবিরত কালো ধোঁয়া আকাশের বুকে মেঘের মতো উগরে দেয়, তা থেকে আর তপ্ত ধোঁয়া বের হচ্ছে না দেখে কয়েকটা চিল চিমনির মুখে ঘেরা জায়গাটায় কাঠকুটো সাজিয়ে বাসা বেঁধেছিল।

গেটের দারোয়ান সুন্দর সিং আজ সকালেই গল্প করছিল, 'রোদ আউর বারিষ মে গেটকা তালা এ্যায়সা খিঁচ গায়া কি যিতনা চাবি ঘুমায়, যিতনা ঘুমার খোলে নেহি। তব সেন সাহাব নে বোলা কি সুন্দর তুমি তালা তোড়ে দাও। তো ফিন হ্যাম ফোর্জিং ডিপার্ট সে হাতাউড়ি লে আকে মারতে মারতে...'

পাঁচশ একান্ন দিনের আগের দিন কারখানায় নাইট শিফ্‌ট শুরু হবার আগে জেনারেল ম্যানেজার চৌধুরী নিজের চেম্বারে বসে লক-আউট নোটিশে স্বাক্ষর করার পর মানসিক উত্তেজনা অথবা বিচলতার কারণে আর্জেন্ট ফাইলের আলমারিটা লক করতে ভুলে গেছিলেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, জানালাগুলো ছিল খোলা। রাত্রি শেষ হবার আগেই লক-আউটের সংবাদটা মোটামুটি চাউর হয়ে যাবার পর আর কেউ কারখানায় ঢুকতে পারে নি। তারপর এতগুলো দিন খোলা জানালা ডিঙিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক চড়ুই পায়রা ম্যানেজারের সাজানো চেম্বারে ঢুকে নির্বাধ দৌরাত্ম চালিয়েছে। কারখানা খোলার পর চৌধুরী সাহেবের আর্জেন্ট ফাইলের আলমারিটা খড়কুটোয় ঠাসা।

সকাল থেকে গজু সাহা থেকে থেকে একবার করে ড্রাইভার কেবিনে ঢোকে, ইঞ্জিন পরখ করে, আবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু ক্রেন আর চলে না। এবারও ড্রাইভার কেবিন থেকে বেরিয়ে ক্রেনের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। নিচে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে; 'সুখিয়া, তুম সুপারভাইজার কা পাশ খবর ভেজা ?'

'হ্যাঁ, ভেজা তো।'

'আতা কিঁউ নেহি ?'

'ক্যা মালুম।'

অবশ্য সুপারভাইজারের আসা অথবা না-আসা একই। সে এসে ক্রেনটা চালু করে দেবে না। রিপোর্ট নেবে চলে যাবে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দেবে ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজারের টেবিলে। তবু ক্রেনটা চলছে না—শুধু এই সংবাদটুকু ক্রেনে যারা কাজ করছে, এর সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের কাছ থেকে যথার্থ স্থানে যাওয়া দরকার—সেজন্যই সুপারভাইজারকে খবর দেওয়া।

নিচে ওদের তিনজনের মধ্যে ফটিক মণ্ডল বলে, 'বুঝলে গজুদা, এ যার জিনিস সে যদি থাকত, দেখতে সুপারভাইজার-টাইজার কোনো শালাকে ডাকতে হতো না। ক্রেন চলত গড় গড় করে।'

ফটিক মণ্ডল যে সনাতন মিস্ত্রীর প্রসঙ্গ বলছে, ওদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই সেড তৈরির পর থেকে এই ক্রেন সে নিজ হাতে নাড়াচাড়া করে এসেছে। সুতরাং এর নাড়িনক্ষত্র যাবতীয় তার ছিল মুঠোর মধ্যে। কিন্তু সনাতন মিস্ত্রী তো এখন গোবরা মেণ্টাল হসপিটালে লোহার ফাটকে বন্দী।

কারখানায় তালাবন্ধির দিনগুলিতে অনাহার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছিল, তখন একদিন সনাতন মিস্ত্রী নিজ হাতে বিষ তুলে দিল বৌ-ছেলের মুখে। তারপর নিজেও খেলো। বৌ আর ছেলেগুলো মরল, সনাতন মিস্ত্রীর লোহা পেটা জান, মরল না—পাগল হল। খবরটা বেরিয়েছিল কাগজে। লোকমুখে ঢি ঢি পড়ল। ছ্যা ছ্যা করল সকলে। বাপ হয়ে এতো নিষ্ঠুর হয়! অথচ সনাতন মিস্ত্রী ছিল উপলক্ষ মাত্র। যারা তার স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য করল, সকলে তাদেরকে চিনত, অভিযুক্ত করল না কেউ।

গজু সাহা রেলিঙের ওপর পায়ের ভার বদল করে সামনের দিকে তাকায়। নিচে লম্বা সেডের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত নানা জাতের লেদ মেসিনগুলো একের পর এক কয়েকটা সরল রেখা বরাবর সাজানো। গজু সাহা সমগ্র সেডটাকে তার দু-চোখের দৃষ্টিতে ধরে সারা শরীরে কেমন একটা অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করে। এই কারখানা, এই মেশিন, কারখানার এই শেড, গায়ে ময়লা তেলচিটে এই উর্দি, উর্দিতে গন্ধ গান্ধ লোহা আর তেল এসব যাবতীয় মিলিয়ে আলাদা একটা প্রাণ, যা থেকে নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা নয়, বাজারে আলু-পটল বিক্রি— নিন বাবু—ফেরেস্! আহা রে, এক

টাকা বিশ কিলো—-এমন মাল কার বাগানে ছিলো-ও।' শালা, তার চেয়ে মেয়েছেলের ইজ্জত বিক্রি অনেক ভালো।

পেটের ধান্ধা করতে বাজার দিয়েছিল গজু সাহা, লক-আউটের শেষ কয়টা মাস।

সুপারভাইজার আসছে দু-সারি লেদের মাঝে সরু রাস্তাটা পেরিয়ে, গজু সাহার চোখে পড়ে। কাছাকাছি আসতে লক্ষ্য করে, সুপারভাইজার হাজরাবাবুর সেই থলথলে শরীর, চামড়ার গায়ে মাখনে রঙ, ভারি চিবুক-চোয়াল সব পাঁচশ একান্ন দিনে ঝরে গেছে। এইসব লোকের এই সমস্যা, এরা জীবনে কখনো বেপরোয়া হতে জানে না। বিপদে পড়লে ছেলে-বৌ-এর হাতে বিষ তুলে দেবার মতো সাহসও নেই, বাজারে আলু-পটল বিক্রি করাটাও সম্মানে বাঁধে।

হাজরাবাবুকে আসতে দেখে সুখিয়া কৈরি গাল দেয়, 'আ রহা হ্যায় শালে শুয়ারকা আওলাদ!'

হাজরাবাবু ক্রেনটার নিচে এসে দাঁড়ান 'কি হয়েছে, ক্রেন চলছে না—'

'কোথায় একটা ডিফেক্ট, ঠিক ধরা যাচ্ছে না!' গজু সাহা বলে।

'ইঞ্জিন চলছে?'

'হ্যাঁ। ইঞ্জিনে কোনো গণ্ডগোল নেই। কিন্তু টোটাল বডি তো নড়ছে না।'

'হুঁ দেখি—' বলে হাজরাবাবু ঝুলন্ত মই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন। হাজরাবাবুর এই মই বেয়ে ওপরে উঠে মেশিন চেক করা, ওদের চোখে নতুন ঠেকে। হাজরাবাবুর কাজ শুধু রিপোর্ট করা। মেশিন খারাপ হলে রিপোর্ট, কাজ করলে রিপোর্ট, না-করলেও রিপোর্ট। ওপর-ওলার কাছে রিপোর্ট চালান করেই হাজরাবাবু খালাস, এতদিন ওরা তাই দেখে এসেছে। আর আজ সেই

হাজরাবাবুর উল্টো আচরণে ওরা বিস্মিত হয়, ওদের ভালো লাগে। পাঁচশ একান্ন দিন কারখানার প্রথাগত পদ্ধতি আর সম্পর্কগুলোকে কি পাল্টে দিল।

একদিন, কারখানায় লক-আউটের আগে, ক্যান্টিন বয় ডিউটি আওয়ার্সে চা দিয়ে গেছে। তিন নম্বর সার্ফেসিং শেদের মেশিন-ম্যান হারু ঘোষ মেশিন বন্ধ করে চা খাচ্ছে আর পাশে একজনের সঙ্গে কথা বলছে। নজর পড়ল হাজরাবাবুর। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের টেবিলে রিপোর্ট। পরদিন চার্জসিট।

হারু ঘোষ ধরল হাজরাবাবুকে, 'এটা কি রকম হল হাজরাবাবু ?'

'আমি কি করবো বলো।' হাজরাবাবুর ভালোমানুষি উত্তর।

'একটা মিথ্যে রিপোর্ট দিলেন !'

'মিথ্যে ? তুমি কাজের সময় গল্প করছিলে—'

'না, চা খেতে খেতে কথা বলছিলাম।'

'ঐ একই হল।'

'কি করে একই হল ? কাজের সময় চা খাওয়া বেআইনী নয়, আর চা খেতে খেতে তো কাজ করা যায় না, তাই ছুটো কথা বলা বেআইনী ?'

এরপর হাজরাবাবুর স্বভাবজ ভঙ্গিতে চোখ ভ্রু-ঠোঁট-গলা একত্রে একই মাত্রায় তেরচা করে উত্তর হল, 'তোমার কাছে কি আমায় আইন শিখতে হবে ?'

রাগ আর বেঁধে রাখা যায় না। দাঁতে দাঁত চেপে হারু ঘোষ, 'এ তো শালা ত্যাঁদোড়ের মতো কথা বলছেন আপনি ?'

জল গড়িয়েছিল অনেক দূর।

ড্রাইভার কেবিনে ঢুকে সুপারভাইজার হাজরা ইঞ্জিন পরীক্ষা করেন। কয়েকবার ইঞ্জিন চলার শব্দ শোনা যায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর

আবার নিচে আসেন। এক হাত তুলে মাথায় সাদা টাক ঘষতে ঘষতে ঠোঁট উলটিয়ে 'ফল্ট তো ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি গুপ্তর কাছে খবর দিয়ে আসি।'

হাজরাবাবু যে পথে এসেছিলেন সে-পথে বিদায় নেন।

ওরা তিনজন শ্রমিক আবার সেই লোহার স্লাবটার ওপর একে একে এসে বসে। গজু সাহাও ওদের পাশে জায়গা করে নেয়। 'খেল খতম পয়সা হজম!' গজু সাহা বলে।

'হাজরাবাবুর এক্সটেরা কেরামতি শেষ!'

জামাল বলে,'এ শালা এখন সহজে ঠিক হবে না। সব মেশিনই তো ভোগে। কারখানায় মাত্র পাঁচ-ছটা মেকানিস্ট। কতগুলো সারাবে।'

সুখিয়া কৈরির দিকে গজু সাহা হাত বাড়ায় 'একটা বিড়ি ছাড়—'

'বিড়ি? তলব মিলনে কা বাদ…'

'ভাক্ শালা। নিকাল জলদি—'

'লাও! বিড়ি ক্যাঁহা সে মিলি। আরে বাই, পানশো একাওন রোজ লক-আউট—ঘরকা আউরৎ ছোড়কে সবকুছ বিকানা পড়া।'

'তা শালা ওটাকেই বা বাকি রাখলে কেন?'

সুখিয়া কৈরি জিভ কাটে, 'এইসা বাত্ মাৎ বোলনা। উসকা বাপ হামারা উপর জিম্মেদারি দেনে ক্যা টাইম মে বোলা কি, হামারা বেটি কো তুম দেখভাল করো, আপনা কামমে লাগাও। মগর কিসিকা হাত্ত মে ছোড়ে নেহি।'

সুখিয়া কৈরির এমন অকপট রসিকতায় ওরা সকলে প্রাণ খুলে হাসে। জামাল বলে, 'যা হালত্ হয়েছিল, আর কিছুদিন লক-আউট চললে দেখতে সব শালাকে ঐ শেষ সম্বল ঘরে আউরতটাকেও বিক্রি করতে হতো। নইলে শালা সনাতন মিস্ত্রীর মতো, গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে ফিনিশ—'

ওরা এভাবে পরস্পর কথা বলে চলে, আর সেই কথা বলার মধ্য দিয়ে লক-আউটে দুরূহ দিনগুলোর নানা প্রসঙ্গ উঠে আসে। কথা বলতে বলতে ওরা এক সময় দেখে ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার গুপ্ত সাহেব আসছেন, দু-সারি লেদের মাঝে সরু রাস্তাটা ধরে। সঙ্গে হাজরাবাবু। একেবারে গুপ্ত সাহেবকে আসতে দেখে ওরা বিস্মিত হয় রীতিমতো। ওরা উঠে দাঁড়ায়। গুপ্ত সাহেবের চলায় বেশ ব্যস্ততা। এক তাড়া জুট হাতে নিয়ে বার বার হাত মুছছেন। গুপ্ত সাহেব এতক্ষণ অন্য কোনো মেশিন চালু করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ওর ঘাম জবজবে পোশাক আর তেল-কালি মাখা হাত দেখে অনুমান করা যায়। ওদের সামনে এসে দাঁড়ান গুপ্ত সাহেব। সবকিছু শোনেন।

'হুঁ। ক্রেনের টোটাল বডিটাকে অয়েলিং করেছিলে ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'গিয়ার, বল বেয়ারিং—সব ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'কোথাও শর্ট সার্কিট ?'

'না স্যার।'

'তাহলে…' গুপ্ত সাহেব চিন্তিত। লম্বা পায়ে ঝুলন্ত মইটা দিকে এগিয়ে যান। হাজরাবাবু পিছু অনুসরণ করতে করতে 'স্যার আপনি ওপরে—।' গুপ্ত সাহেব কোনো উত্তর না দিয়ে মই বে ওপরে উঠতে থাকেন। কয়েক ধাপ উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন। নি তাকিয়ে হাল্কা হেসে 'বুঝলে হে, ঘরে বৌ-ছেলে আছে, পড়ে গে দেখো, অন্তত কমপেনসেসনটা যাতে পাই…'

নিচে ওরা সকলে হেসে ওঠে, এক সাথে, গুপ্ত সাহেবের এম জমাটি রসিকতায়। গুপ্ত সাহেব রসিকজন, প্রচার আছে। কি কারখানার সেডে শ্রমিকদের সামনে তাঁকে এমন মেঠো রসিক করতে, বিশেষত সুপারভাইজারের উপস্থিতে—কখনো দেখা যায় নি

কারখানায় কাজের স্তর পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে, আর সেই সম্পর্ক অনুসারে নির্ধারিত হয় কথা বলার ধাঁচ ধরন ইত্যাদি। এটাই নিয়ম। আর এখন তার ব্যতিক্রমে ওরা অবাক হয়। একটা দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান কি সম্পর্কগুলোকেও পাল্টে দিতে পারে?

গুপ্ত সাহেব ড্রাইভার কেবিনে ঢুকে হাজরাবাবুর মতো ইঞ্জিন পরীক্ষা করেন। তারপর নিচে নেমে এসে হাজরাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ইঞ্জিনে তো কোনো ডিফেক্ট নেই। আমার মনে হয় কি জানেন, বডির কোনো ভাইটাল পার্টস—এতো দিন তো আইডেল্ হয়ে পড়েছিল ক্রেনটা—ঠিক মতো ফাংশন করছে না।'

'আমারও এতক্ষণ ধরে ঠিক এরকম একটা সাসপিশন স্যার··'

গুপ্ত সাহেবের ছড়ানো পাঁচ আঙুলে মুখ ঢাকা। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখী। ডান পায়ের জুতো সমেত গোড়ালি মাটির ওপর ওঠে আর নামে। এক সময় সামনের দিকে তাকান গুপ্ত সাহেব, 'এই যে তুমি, হ্যাঁ তুমি, কি নাম যেন—'

'জী, সুখিয়া কৈ—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তুম যাও, জলদি, দো নম্বর স্টোর মে—এক রশি, বড়া দেখকে, হিঁয়া সে ও-ও খামবা তক্—লে আও!'

কয়েক মুহূর্ত পর সুখিয়া কৈরি একটা বড় মোটা শনের দড়ি টানতে টানতে নিয়ে আসে। গুপ্ত সাহেবের নির্দেশে দড়ির দুটো খুট উঁচুতে ক্রেনের দুই প্রান্তে শক্ত করে বাঁধা হয়। ফলে বাকি দড়িটা অর্ধ বৃত্তাকারে ঝুলে পড়ে মাটিতে। গুপ্ত সাহেব গজু সাহাকে ড্রাইভার কেবিনে যেতে বলেন আশেপাশে লেদ মেসিনগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের ডেকে আনা হয়। তারপর ম্যানেজার সাহেব সুপারভাইজারবাবু, শ্রমিকরা সকলে মিলে দড়িটা বেড় দিয়ে ধরে টানতে থাকে সামনের দিকে।

দাতে দাঁত মানুষগুলো। শরীরের সমস্ত শক্তি অর্পিত একটা দড়ির

ওপর। শক্ত পায়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরার উদ্যম। মুখে অস্ফুট চিৎকার—'হেঁ-ই-ই-ই-ও-ও-ও...'

প্রথম একটা জড় ভারকে গতিশীল করতে যতটা শক্তি আরোপ করতে হয়, তারপর সেটা ক্রমশ বেগবান হতে হতে শক্তির আরোপণও কমায়—এবং এক সময় ওরা দেখে ক্রেন, ক্রেনের গোটা দেহ আপনা থেকেই চলতে শুরু করেছে। সামনের দিকে কিছুটা গিয়ে ক্রেনটা গিয়ার চেঞ্জ করে পেছনের দিকে মোড় নেয়। ড্রাইভার কেবিন থেকে গজু সাহার খুশিতে উচ্ছলিত মুখ বাইরে বেরিয়ে আসে। আনন্দে চিৎকার করে ওঠে গজু সাহা, 'ও-হো-হো হো-আ-আ-আ...'

আর নিচের মানুষগুলোর মুখেও একটা সাফল্যের পর খুশির ঢল। ওরা সকলে হাসে, হাসে আর হাত নাড়ে—একটা প্রচণ্ড বাধা অতিক্রমণের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে।

এটা একটা ছবি। একটা মুহূর্তের দুষ্প্রাপ্য একটা ছবি। একে তো চিরস্থায়ী ধরে রাখা যায় না। একে একে যন্ত্রগুলো আবার সচল হয়ে উঠলে, যন্ত্রের উদর থেকে কাঁচা মাল পণ্য হয়ে বেরিয়ে এলে এ ছবির মুখ, ভাবভঙ্গি, অবস্থান, ভাষা সব আলাদা হয়ে যাবে, হয়ে যায়...

পবিত্রতার অদল-বদল

১

ছয় নয়, এখানে তিনটি ঋতু বারোমাসে, তিনটাই—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এখানকার মানুষের খিন্ন জীবনে লুঠেরার মতো হানা দেয়, তামাম এই বস্তি তল্লাটে। বছরে বাকি তিন ঋতুর লাজুক স্পর্শ, মাঠ-নদী-নগর পেরিয়ে কখন যে এই গলি ঘুপসির সংকীর্ণ জীবন ছুঁয়ে যায়, এরা মালুম পায় না।

নানির ঘুম ভাঙে। ঘুম অবশ্য ওর সারা রাতেও হয় না। শুধু ঘুমের আবেশ, বাইরের থকথকে কুয়াশার মতো, ওর চেতনায় ঘিরে থাকে। একটা খুপরি, মাটির দেয়াল, একটা জানালা, একটা দরজা। সব বন্ধই থাকে। তবু রাত বাড়ে, আর ঠাণ্ডায় ঘরের বাতাস ভারি হয়, আর নানির দলা-পাকানো ন্যাতার মতো দেহে শিরশিরানি বাড়ায়।

গায়ের তেলচিটে ভারি কম্বলটা সরিয়ে নানি উঠে বসে। ডান দিকে শরীর হেলিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। মেঝের ওপর পাতা আর একটা বিছানায় হাত বুলিয়ে অনুমান নেয়। না, সায়েব নেই। 'কাঁহা কাঁহা ঘুমে রাতভোর, ক্যা মালুম!' সায়েবের বিছানার দখল নিয়ে শুয়ে থাকা একটা কুকুরের গায়ে নানির হাত লাগে। কুকুরটা বিরক্ত হয়। 'গ-র-র' করে শরীর আরো গুটিয়ে ফেলে। নানি অন্ধকার হাতড়ে বিছানার পাশে রাখা লাঠিটা খুঁজে নেয়। তারপর

কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দরজার সামনে আসে। দরজা খুলতেই নোনা ধরা ইঁটের দেয়াল, ছিটে বেড়া, টালির চাল ডিঙিয়ে ভোরের কৃপণ আভা ঘরে ঢুকে পড়ে। নানি ঘর ছেড়ে বস্তির গলিতে পা দেয়।

সমগ্র বস্তি এখনো ঘুমে বেহুঁশ। ভোর গড়িয়ে সকাল। তারপর সকাল গড়াতে গড়াতে সূর্যটা যখন আকাশ বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে আসে, আর সূর্যের তাপ হয়ে ওঠে গায়ে লাগার মতো, তখন বস্তির ঘুম ভাঙে। চটকলে প্রথম শিফট শুরু হয় সকাল সাড়ে পাঁচটায়। প্রথম শিফটে যাদের ডিউটি, তেমন গুটিকয় মানুষ প্রথম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। আর তার একটু আগে নাইট শিফটে যাদের ডিউটি ছিল, তারা সারা রাতের শেষে ক্লান্ত টলমল শরীরে ফিরে আসবে ঘরে।

শীতের সকালে ঠাণ্ডার কামড়। শরীরে কাঁপ ধরিয়ে দেয়। দাঁতে দাঁতে অনবরত ঠকঠকানি। শরীরের রক্ত হিম। নানি গায়ের কম্বল টেনেটুনে শক্ত করে জড়িয়ে নেয়।

সামনে গলিটা যেদিকে সোজা গিয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, নানি সেদিকে হাঁটা দেয়। হিম আর কুয়াশায় সামনের গলিপথটাও ঠিক নিরিখ করা যায় না। গলির ধারে পোস্টের বাতিগুলো এখনো জ্বলছে। জ্বলন্ত বাতি থেকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই থকথকে কুয়াশা ব্লটিং কাগজের মতো আলো অনেকটা শুষে নিচ্ছে।

নানি ঠুকঠুক হাঁটতে হাঁটতে শুকদেবের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের ঝাঁপ এখন বন্ধ। ভেতরে শুকদেব ঘুমায়। বাইরে ঘেঁষ-চাপা উনানে এখন লাল-নীল লকলকে আগুনের শিখা। নানি দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দেয়—'শুকিয়া উঠ উঠ। উঠব না ক্যা! এ এ শুকিয়া—'

প্রথম ডাকে শুকিয়া কখনো ওঠে না, বা সাড়াও দেয় না, নানি

জানে। তাই দ্বিতীয় দফায় ডাকার আগে নানি উনানের সামনে এসে বসে। উনানের শিখায় হাত-মুখ শরীর মেলে ধরে। হাতের চেটো বার বার ওল্টায়-পাল্টায়, যেমন ভাবে শুকদেব সারাদিন উনানের তাপে রুটি উল্টে-পাল্টে রোস্ট করে। উনানের তাপ শরীরে সঞ্চারিত হয়, রক্তে সঞ্চারিত হয়, দেহের অস্থিসন্ধিতে সঞ্চারিত হয়। চটকলে সাইরেন বাজে, দিনের প্রথম, আর সে সাইরেনের ভোঁ বস্তির ঘুমন্ত মানুষগুলোর মধ্যে যাদের কানে পৌঁছানোর, অবধারিত ভাবেই পৌঁছে যায়। নানি উনানের গোড়া থেকে উঠে আবার দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দেয়—'ক্যা রে শুকিয়া তু উঠবো করি না ক্যা? দেখ সবের হো গায়ি—দেখ, আভিতক তু নিদ যাতি—এ শুকিয়া—'। শুকিয়া এবার সাড়া দেয়। আরো কয়েকবার ধাক্কাধাক্কির পর ওঠে। উঠে দরজা খোলে। নানি আবার দোকান ছেড়ে রাস্তায় নামে।

শুকদেবকে ঘুম থেকে তুলতে নানিকে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয় এক-একদিন: যত ডাকো, যতই ধাক্কাও, শুকদেব আর ওঠে না। শুকদেবকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া নানির সারাদিনে প্রথম কাজ। অবশ্য এর বদলে বিনা পয়সার এক ভাঁড় চা আর একটা নিমকি বিস্কুট নানির বরাদ্দ। মিশিরজির খাটালে কাজ সেরে এসে নটা সাড়ে নটা নাগাদ শুকদেবের দোকানে ঐ ফোকটিয়া চা-বিস্কুটে নানি নাস্তা সারে। নানি এখন মিশিরজির খাটালেই যাবে। খাটাল পরিষ্কার করবে। গোবর তুলে ডাঁই করবে এক জায়গায়।

বস্তির গলিটা এসে মিশেছে জি-টি রোড মূল সড়কের সঙ্গে। সড়কে উঠতেই গলির এক পাশে এক রাশ পোড়া টায়ার, টায়ারের ছাই। রাত্রে রিকশাঅলা ছেলেগুলো ঠাণ্ডায় টায়ারের আগুন পোহায়। সড়কের রাস্তা পশ্চিমে বহুদূর গিয়ে মিশেছে বোম্বে রোডের সঙ্গে আর পুবে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে ঢুকেছে কলকাতায়।

রাত্রিবেলাও এ-রাস্তার বিশ্রাম নেই। কলকাতা আর পশ্চিমে ধানবাদ, টাটানগর, কটক, ময়ূরভঞ্জের ব্যবধানে মাল বোঝাই ভারি ট্রাকগুলো গাঁক গাঁক শব্দে ছুটে চলে সারা রাত।

নানি পশ্চিমে সড়কের ধার ঘেঁষে হাঁটা দেয়। ওর ডান দিকে সড়কের ওপারে চটকলের লম্বা শেড। শেডের ভেতর স্যাকিং মেশিনের সারাদিন ঘট ঘট শব্দ। মাঝে মাঝে হঠাৎ যখন লোড-শেডিং হয়, বিশেষত সন্ধ্যায়, সমস্ত আলো টুপ করে নিভে যায়, সমস্ত শব্দের অপমৃত্যু ঘটে—এবং তখন, এই বস্তি, এই কারখানা, এই নিবিড় জনবসতির সমন্বয়ে যে জগৎ, তা যেন প্রেতগ্রস্তের মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকে।

নানির বাঁ-হাতি বস্তির এলোমেলো বেঢপ ঘরগুলোর ভিড় যেন রাস্তার ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বস্তি এলাকা পার হলে কবরস্থানের দীর্ঘ পাঁচিল। তার ওপাশে শালিমার গো-ডাউনের শেড। নানি নিত্যসকালের পরিচিত এই পথটুকু পার হয়ে যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে। পায়ের সামনে লাইট পোস্টের নিচে একটা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পা দুটো ছড়ানো। হাত দুটো মাথার দুদিকে ছড়ানো। হাতের দুই মুঠি যেন সমতল মাটি খামচে ধরতে চায়। চলতি পথে বাধা। নানির রাগ হয়, ঘৃণা ধরে।

'কৌন হারামখোর দারু পিকে রাতভোর রাস্তামে পড়া হুয়া!' হাতের লাঠি দিয়ে লোকটার পিঠে খোঁচা মারে—'এ্যায় শালা শুয়ারকা আওলাদ, দেখ তোহার আউরৎ তোকে ছোড়কে ভাগল বা—দেখ উঠকে…।' তবু লোকটা নড়ে না। লোকটা নেশায় একেবারে বেহুঁশ। বাইরের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অনবরত শিশিরপাত ওর অনুভূতিতে কোনো সাড়া জাগায় না। নানি বিরক্ত হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যায়। কি ভেবে আবার ফিরে আসে। মানুষটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। একটা হাত কাঁধের ওপর রেখে হেঁচকা টানে মুখটা

সোজা করে দেয়। আর তখন নানির বুক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। নানি মাটির ওপর বসে পড়ে। মাটির ওপর থেকে মাথাটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরে। 'এ তো মেরা সাহেব। মেরা রাজা সাব। মেরা লাল। এ তোহার ক্যা হইলি সায়েব '। সায়েবের চোখ আধবোজা। চোখের মণি স্থির। ঠোঁটের কানাচ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে রাস্তার মাটি অনেকটা ভেজা, যেখানটায় সায়েব মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

নানির অনুভূতিগুলো ক্রমশ লোপ পায়। মিশিরজির খাটাল কারখানার ঘটঘটানি, প্রাকৃতিক শীতাতপ ইত্যাকার বোধ চিন্তা-ভাবনা ভুলে যায়। নানি হিম হয়ে যাওয়া সায়েবের শরীর জড়িয়ে ধরে, আর নিজের বুক চাপড়ায়, আর কাঁদে—'তোকে অ্যায়সা কৌন মারলাস্ রে—হায় ভগওয়ান! তু বাত বোল মেরে লাল—হায় ভগওয়ান! হাম তোকে বিনা ক্যায়সে বাঁচব—হায় ভগওয়ান!'

যেন একটা প্রাচীন গাছ ঝড়ো হাওয়ায় থরথর। আচম্বিত চিন্তায় নানির কান্না ক্ষণিক থেমে যায়। নানি উঠে দাঁড়ায়। তারপর যে-পথে এসেছিল সে পথে বস্তির দিকে ফিরে যায়।

চটকলে দিনের দ্বিতীয় সিটি বেজে উঠল। নাইট শিফট শেষে কারখানা থেকে শ্রমিকরা বেরিয়ে আসছে একে একে। যেন যুদ্ধ শেষে শিবির-ফেরা ক্লান্ত বিপর্যস্ত সৈনিক। নানি আবার শুকদেবের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। শুকদেব সবেমাত্র গোসল সেরে এসে ঘর থেকে ভাঙা শো-কেস, বাক্স, ডিবে-ডাবা বের করে দোকান সাজাচ্ছে।

নানির ন্যুব্জ দেহটা এখন খাড়া, একটা শুকনো সোজা ডালের মতো। চোখের দৃষ্টি উদাস স্থির। গায়ের কম্বল রাস্তায় লোটায়। মাথায় চটকলের পাটের ফেঁসোর মতো সাদা কয়েক গাছি চুল বাতাসে কাঁপে।

'শুকিয়া, সায়েব মর চুকা !'

'ক্যায়া ?' শুকদেব যেন চমকে উঠে নানির দিকে তাকায়।

'সায়েব মর চুকা…'

'ক্যায়সে ?'

'ম্যায় তো না জানে শুকিয়া। ম্যায় তো দেখা, ও গোরস্থানকা বগল মেরা লাল'মু গুজারকে পড়া হুয়া।'

নানির কথায় শুকদেব কি একটা অনুমান নেয়। আস্তে আস্তে ওর বিস্ময় কৌতূহল থিতিয়ে আসে। আগের মতো আবার ডিবে-ডাবা সাজানোয় মন দেয়।

নানি শুকদেবের দোকান ছেড়ে বস্তির আরো গভীরে ঢোকে। আগরওয়ালার গুদাম ঘরের পেছনে কাঁচা ড্রেনের পাশ দিয়ে লখিয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছায়। লখিয়ার দরজা বন্ধ। লখিয়া ভেতরে ঘুমোয়। নানি অনবরত দরজা ধাক্কায়। 'লখিয়া রে দরওয়াজা খোল। সব বরবাদ হো গয়ি রে লখিয়া। তোহার বেটা মর চুকা রে লখিয়া। জলদি দরওয়াজা খুল…'

এক সময় লখিয়া দরজা খোলে। দ্বারের ও-প্রান্তে লখিয়া দাঁড়িয়ে। লখিয়া বয়সে এখন প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি, তবু শরীরের বাঁধুনি, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ইঙ্গিত দেয়, একদা ওর রূপ ছিল।

'লখিয়া তোহার বেটা মর গায়ি '

নানির কথায় লখিয়ার সবেমাত্র ঘুমভাঙা স্নিগ্ধ আবেশ বিঘ্নিত হয়। ভ্রূ-চোখে কিছু শিথিল জিজ্ঞাসা। পরক্ষণেই সে জিজ্ঞাসা মুছে দিয়ে বিকারহীন স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেয়; 'তো ম্যায় ক্যা করি !'

'মেরা সায়েব রাস্তা মে মু গুজারকে পড়া হুয়া…'

'তো ম্যায় ক্যা করি ?' লখিয়া নানির মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। নানি দরজায় করাঘাত করে কাঁদে ইনিয়ে-বিনিয়ে।

২

সায়েব নামের একটা পশ্চাৎ-কাহিনী আছে।

প্রায় পঁচিশ, কিংবা তারও কয়েক বছর আগে লখিয়া স্বামীর হাত ধরে উঠেছিল এই বস্তিতে। নববিবাহিতা নিঃসন্তান লখিয়া। এসেছিল বিহারের বিলাসপুর থেকে। লখিয়ার স্বামী কাজ পেল চটকলের ডায়িং ডিপার্টমেণ্টে। একদিন রোলিং মেশিনে কাজ করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওর শরীর সেঁধিয়ে গেল মেশিনে।

লখিয়ার জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ। এরপর নিদেন বাঁচারই জন্য করুণ চেষ্টা।

তখন চটকলে কাজ করত এক বিলিতি সাহেব। নাম ফরস্টার ম্যাকেঞ্জি। লোকে ডাকত পাগলা সাহেব বলে। লোকটার নেশা করার কোনো বাঁধাধরা সময় ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা তার ঠোঁটে মদের বোতল উপুড় করা। কারখানায় কাজের পর সারাদিন বস্তির রাস্তায়, দোকানে, চোলাইয়ের আড্ডায় পড়ে থাকত।

লখিয়ার স্বামী মারা যাবার পর ওর ঘরে ঢুকতে শুরু করল ম্যাকেঞ্জি সাহেব। অবশ্য ও নিজে ঢুকল, নাকি লখিয়াই ওকে প্ররোচিত করল, তা অনির্ণেয়। বছর ঘুরতে না-ঘুরতেই একটা ছেলে হল লখিয়ার। ব্যাণ্ডপার্টি এল, ইংরেজি বাজনা বাজল আর বাজনার তালে তালে বেটাল পায়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব নাচল খুব।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব নেশার ঘোরে একদিন মুখ গুজরে পড়ল ড্রেনে, আর মরল।

লখিয়ার ছেলে বড় হয় আর ওর দেহে ম্যাকেঞ্জি সায়েবের আদল হুবহু ফুটে উঠতে থাকে। সেই খাড়া নাক, কটা চোখ, খয়েরি কোঁচকানো চুল, ফর্সা গায়ের রং আর পেশল তীক্ষ্ণ চেহারা।

ম্যাকেঞ্জি সাহেবের প্রতিমূর্তি হয়ে লখিয়ার ছেলে বেড়ে ওঠে আর লোকমুখে নামটাও তৈরি হয়ে যায়—সায়েব।

সায়েবের বয়স যখন বিশ, চটকলের এক বাবু ওর চেহারা দেখে কারখানায় লেবারের কাজে ঢুকিয়ে নিল। একদিন সায়েবের নাইট-শিফট। ডিপার্টমেণ্টাল সুপারভাইজার রামচন্দ্র বেরিয়েছেন শেডে টহল দিতে। সেই সুযোগে সায়েব সুপারভাইজারের চেম্বারে টেবিল জোড়া লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। এমন সময় জেনারেল ম্যানেজার খান্নার কোয়ার্টার থেকে আর্জেণ্ট টেলিফোন এল। ফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে অনবরত। অনেকক্ষণ পরে সায়েব ঘুম চোখে উঠে রিসিভার ধরল। ওপাশ থেকে খান্নার কণ্ঠস্বর, 'হ্যালো রামচন্দ্র…'

'সায়েব জানে না। ঘুম ভাঙার রাগে বিরক্তিতে বলে বসল, 'নেহি হনুমানচন্দ্র—'

সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেল। পরের দিন থমথমে মুখে জেনারেল ম্যানেজার খান্না সোজা নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। প্রথমে ডেকে পাঠালেন সুপারভাইজার রামচন্দ্রকে। দুজনে কি কথা হল, তারপর ডাক পড়ল সায়েবের। চেয়ারে খান্নার টান টান শিরদাঁড়া। চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ সটান দৃষ্টি সায়েবের দিকে। 'ইউ ছ্যাট বয়, ডেয়ার টু জোক মি। আই উইল সি ইউ—' কথাটা ছুঁড়ে দিলেন, শত্রুপক্ষের দিকে গোলা ছোঁড়ার ভঙ্গিতে।

সায়েবের চাকরি আর পার্মানেণ্ট হয় নি, তার আগেই খতম।

চাকরি হারিয়ে সায়েবও তলিয়ে যেতে লাগল, ক্রমশ, সংকীর্ণ জীবন এবং জীবন-সংশ্লিষ্ট অন্ধকারে।

জুয়া, চরকি, সাট্টা—দোক্কা মে এক, চৌকা মে চার। লাগে তো আয়ে, না লাগে তো ভোগমে যায়ে! রাত্রে রালা সিং-এর হোটেলের পর্দা ঢাকা ঘরে। টেবিলে বোতল, ভেজা ছোলা, আদা কুঁচি।

সোডা বোতলের ছিপি খুললে ভ-স্-স্-স্। গ্লাসের মুখে মদের বোতল উপুড় করলে ক-ল্-ল্-ল্। দুটো মিশিয়ে গলায় ঢেলে ঢক ঢক ঢক···। সায়েবের শরীরে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনটা যেন চটকলের চিমনি থেকে উদ্গারিত ভক্‌ভকে ধোঁয়া। পাক খেয়ে-খেয়ে শূন্যে উড়ে যেতে চায়। আকাঙ্ক্ষাগুলো কেশর ফোলানো লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো দিক্‌বিদিকে ছুটে যেতে চায়। সায়েবের মনে হয় তখন সে সবকিছু পারে—দুনিয়ার যত খতরনাক কাম! যত দুশমন আছে সকলের পেট ফাঁসিয়ে দিতেও ওর হাত এতটুকু কাঁপবে না। রালা সিং তখন তাকিয়ায় শরীর এলিয়ে পাখির পালক কানে ঘোরায়, আর কুতকুতে চোখে দোকান নিরীক্ষণ করে, আর মাঝে মাঝে বাচ্চা চাকরদের ধমকায়, 'শালে তেরে বহিন কো—দেখ শালে তিন নম্বর ক্যা মাঙতি!' আর গ্রামোফোনের ডিস্কে তখন হিন্দী ফিল্মের চনমনিয়া সুর—'রাত মে খায়ো-পিয়ো, দিন মে আরাম করো—লা-লা-লা, লা-লা-লা-লা—'

শালিমার গো-ডাউনে চোরা চালান করতে গিয়ে ধরা পড়ল সায়েব। ছ-মাস ফাটকে কাটিয়ে ছাড়া পেল।

লখিয়ার সঙ্গে সায়েবের সম্পর্ক কোনো দিনই ভালো নয়। হাঁটি-হাঁটি পা-পা বয়স থেকেই সায়েব মা ছাড়া। নানির কাছে মানুষ। নিজের নানি নয়। একই বস্তিতে থাকে। ঘুঁটে দিয়ে, কয়লা কুড়িয়ে পেট চালায়। একক জীবনের ভালোবাসা আর মায়ার টানে নানি ছেলেটাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে।

বড় হয়েও দু-একবার মায়ের কাছে যাবার চেষ্টা করেছে সায়েব। লখিয়ার দোরগোড়ায় পা দিলেই লখিয়ার সাফ জবাব, 'আগাড়ি রুপেয়া ফেক, তব আন্দার আ রোটি খা—'

এই একটা কথা, সায়েবের রক্তে যেন বিষ ঢেলে দেয়, 'বেশরম রাণ্ডি! থুক্ তোহার রোটি মে—থু থু থু—'

লখিয়াকে ঠুকরে কেউ রেহাই পায় না। বদলা ও নেবেই। এক ঝটকায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে লখিয়া—'ওঃ হো-হো-রে—ম্যায় রাণ্ডি! তু ক্যা—তু? রাণ্ডি কা আওলাদ, দোকলা কা বেটা—'

এ-ভাবে, ঠিক এ ভাবেই, মা আর সন্তানের সনাতন সম্পর্ক, বাস্তবজীবনে ওদের কখনোই চিরায়ত পবিত্র আদল পায় না।

৩

লখিয়ার বন্ধ দরজায় মাথা কুটে কেঁদে নানি অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে। লখিয়া আকণ্ঠ লেপে ঢেকে খাটিয়ায় শুয়ে। ঘরের দেয়ালে ওর দৃষ্টি, স্থির। মেজাজ তেমনিতেই ভালো নয়। কড়-কড়ে চারশটা টাকা চোট গেল, এত হুঁশিয়ার হয়েও—তকদিরের মার।

স্থানীয় থানা-পুলিশ কখনো এভাবে হানা দেয় না। ওদের মাসোহারা বন্দোবস্ত। হানা দেবার আগে গোপন নোটিশ দেয়। তার আগে মাল সরিয়ে ফেললেই হল।

কিন্তু আবগারির বড় কর্তারা মাঝে মাঝে চড়াও হয়ে বড় জ্বালাতন করে। ওদের হাতে পড়লে আর ছাড়ছোড় নেই।

সেদিন রাত্রে কেমন যেন একটা গন্ধ পেয়েছিল লখিয়া। ভোর হতে-না-হতে চোলাইয়ের বোতল আর ব্লাডারগুলো উঠানের তারে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তার ওপর একটা লেপ দিয়েছিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তারে লেপ শুকচ্ছে।

যা আঁচ করেছিল তাই। বেলা দশটা নাগাদ আবগারি বিভাগের ভ্যানটা ঢুকল বস্তির ভেতর। লখিয়ার ঘরে ঢোকার গলির মুখে ব্রেক কষল। ঝপাঝপ নেমে পড়লেন থানার ছোটবাবু, আবগারি বিভাগের এক কর্তা আর কয়েকজন আবগারি পুলিশ। লখিয়ার ঘর তন্নতন্ন করল। রান্নার একচিলতে জায়গাটায় ঝুলন্ত মাচাটা টেনে

ভেঙে দিল। সারা উঠোনময় বুটের ঠোকর মেরে দেখল মাটির নিচে কোথাও মাল লুকনো আছে কি না। একটা শূন্য জালা ছিল, লাঠির আঘাতে সেটাও ভাঙল।

শিকার ধরার ব্যর্থতায় তখন ছোটবাবুর চোখ মুখ লাল। লখিয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'অ্যাই, মাল কোথায় রেখেছিস?'

লখিয়ার মুখে নির্দোষ হাসি. 'কি যে বলেন বাবু, ও-সব দু-লম্বরি কারবার লখিয়া করে না।'

ছোটবাবু আবগারি অফিসারটির দিকে তাকান, 'বুঝলেন স্যার, এসব খচরা মেয়েছেলের পেছনে পুরে দিতে হয় আড়াই হাত। তবে শালা সত্যি কথা বেরুবে।'

একজন আবগারি পুলিশ কি ভেবে হঠাৎ তারে ঝোলানো লেপটা সরাতেই মাল বেরিয়ে পড়ল। তারে বাঁধা লাইন দিয়ে ঝুলছে। মালও গেল, লখিযাকে যেতে হল থানায়। একরাত হাজতে কাটিয়ে পরের দিন কোর্টে চালান।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লখিয়া। একটু তফাতে মুখোমুখি একটা বেদির ওপর টেবিল-চেয়ারে জজ সাহেব। লখিয়া যে লোকটার কাছ থেকে চোলাইয়ের চালান আনে, তার চেহারাও হুবহু এ-রকম। থলেথলে দেহ, এ রকম মোটা গোঁফ, মাথায় টাক। জজ সাহেবের গায়ের জামাটা খুলে নিলেই জ্যান্ত গণেশ ঠাকুর, লখিয়ার মনে হয়। হয়ত শাস্তিটা একটু কমই হবে। হয়ত বেকসুর খালাস!

লখিয়া জানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বেশি পাঁয়তারা কষতে নেই। যেমন যেমন প্রশ্ন তেমন-তেমন উত্তর। না হলে শাস্তি বাড়ে, জরিমানা বাড়ে।

'তুমি লুকিয়ে মদ বিক্রি করতে?'

'হ্যাঁ সাব।'

'কেন করতে?'

লখিয়া কাপড় সরিয়ে পেট দেখায়। বুকও দেখা যায়।

হুঁ। কতদিন করতে?'

'নতুন বাবু।'

'লাইসেন্স আছে?'

'না হুজুর!'

এরপর জজ সায়েবের শাস্তি ঘোষণা—'বেকানুনি মদের ব্যবসা করার অপরাধে দু-শ টাকা জরিমানা, নতুবা একমাস কারাদণ্ড।'

দু-শ টাকার মাল গেল, তার সঙ্গে দু-শ টাকা জরিমানা তিন দিন হল লখিয়া সে দুঃখে জ্বলছে।

৪

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা আর কুয়াশা কেটে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সকাল গড়াচ্ছে বেলার দিকে। আর তপ্ত খোলায় চড়বড়িয়ে খৈ ভাজার মতো বস্তির জীবন জেগে উঠছে, প্রাত্যহিক একই ছন্দে চাপা সোরগোল আর মিশ্রশব্দের জাবর কেটে।

সায়েব রাতে তার কাটতে গিয়ে পড়ে মারা গেছে, খবরটা বস্তির কানে কানে চাউর হয়।

কি এক আচম্বিত চিন্তায় লখিয়ার স্থির আনমনা দৃষ্টি চকচকিয়ে ওঠে, অনুভূতিগুলো হয়ে ওঠে সজাগ। লখিয়া বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। গায়ের কাপড় বিন্যস্ত করে বাইরে বেরিয়ে আসে।

বস্তির গলি শেষ হয়, বড় রাস্তায় পড়ে। তারপর রাস্তা ধরে সোজা হাঁটা দেয় পশ্চিমে। বস্তি এলাকা পার হয়ে বাঁ-হাতি কবর-ডাঙার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে। লখিয়ার চোখে পড়ে কিছুটা দূরে রাস্তার ধার-ঘেঁষে মানুষের ছোটখাটো সমাবেশ। রাস্তার অন্যদিকে

দাঁড়িয়ে থাকা একটা কালো ভ্যান। লখিয়া সমাবেশটার পেছনে এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর বাধা দু-হাতে সরাতে সরাতে একেবারে মাঝখানে এসে পড়ে। সামনে একটা সাদা কাপড়ে একটা মানুষের সর্বাঙ্গ ঢাকা। একজন থানাদার বাবু লখিয়াকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'এ ক্যা তুমহারা লেড়কা ?'

'নেহি বাবু, এ তো মেরা পেটকা দুশমন !' লখিয়া উত্তর দেয়। থানাদারবাবু লখিয়ার বাঁকা উত্তর সোজা করে নেয়।

লখিয়া মন্থর মাপা পদক্ষেপে কয়েক পা এগিয়ে আসে। ওর পায়ের কাছে ওর ছেলের হিম হয়ে যাওয়া দেহ। লখিয়া নতজানু হয়ে ছেলের মুখের ঢাকা সরিয়ে দেয়। সায়েবের আধবোজা দু-চোখের দৃষ্টি স্থির, করুণ মুখাবয়ব বেদনাক্লিষ্ট। যেন লখিয়ার মনে বিবর্ণ সুপ্ত স্মৃতিগুলো জাগিয়ে, এবং সেই স্মৃতি বেদনা হয়ে শোক হয়ে···যতই হোক সায়েব তো তারই গর্ভজ—সামনে শায়িত এই যে দেহবিস্তার, একদা যার বীজ সে-ই ধারণ করেছিল নিজ গর্ভে, নিজের শরীরের রস রক্ত তাপ দিয়ে যার আকৃতিদান—মাতা-পুত্রের চিরায়ত পবিত্র উচিত সম্পর্কটা কি তৈরি হয়ে উঠেছে ?

লখিয়া একবার মুখ তুলে টানটান দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় চারদিকে। একটা বৃত্ত। বৃত্তের কেন্দ্রে শিয়রে সন্তান নিয়ে লখিয়া। বৃত্তটাকে ঘিরে গায়ে গায়ে সারি সারি মানুষ। এতগুলো মানুষের কৌতূহলী চোখ, এতো···

'হায় রে মেরা বেটা, তু মুঝে ছোড়কে কাঁহা চলি গ্যায়ে রে···' লখিয়ার দেহ সায়েবের দেহের ওপর। লখিয়া কাঁদে। ওর সজাগ খেয়ালে চালিত একটা হাত সকলের অলক্ষ্যে ঢাকা দেওয়া সাদা কাপড়টার ভেতর সেঁধিয়ে যায়। হাতের পাঁচটা আঙুল হিম আর পাথর হয়ে যাওয়া দেহে কিলবিলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আঙুলগুলো উঠে আসে সায়েবের বুকের ওপর, গলার ওপর। একটা চেন ছিল—

পাঁচটা আঙুলে লখিয়া সাহেবের বুক গলা কণ্ঠা ঘাড় তন্ন তন্ন করে। সোনার। মগরা কাঁহা, নেহি তো—! বিজাতীয় এক ব্যথায় লখিয়ার বুক টনটনিয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে ওর আঙুলগুলো নেমে যায় সায়েবের বাঁ কব্জিতে। কব্জি ফাঁকা—ঘড়িটাও নেই। পুলিশ---পুলিশ নে··· বিপর্যস্ত আশায় লখিয়ার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত কান্না হঠাৎ থেমে যায়। ঘাড় তুলে আত্মগত ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায় কয়েক মুহূর্ত।

থানাদার বাবু লখিয়াকে সরে যেতে বলেন। সেপাইদের হুকুম দেন, 'লাস উঠাও—'

দুজন সেপাই সায়েবের লাস শূন্যে তুলে নিয়ে ফেলে ভ্যানের ভেতর। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভ্যান চলতে শুরু করে।

সায়েবের মিলিয়ে যাওয়া পথের দিকে লখিয়া তাকিয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে।

ওর বুকে এক-রকম ব্যথা জমা হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। এ-রকম ব্যথা ওর আগে কখনো হয় নি, যেমন সায়েবের জন্মের পর দুধ জমে ওর বুক ব্যথা করত—সে-রকম ব্যথা ওর পরে কখনো হয় নি।

মাঠ পূর্ণ থৈ থৈ জনস্রোত, উজানে নৌকা বাওয়ার মতোই কষ্টকর শ্রমে এঁকেবেঁকে পার হয়ে, একেবারে ময়দানের শেষ প্রান্তে আসে ওরা—মোহন আর সুবল। পিছনে তখন বিস্তীর্ণ ময়দান উপচে পড়া মানুষের নিবিড় সমাবেশে। দূর-মঞ্চে বক্তৃতা দেওয়া মানুষটার কণ্ঠ সারি সারি এমপ্লিফায়ারের চোঙার মুখ থেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে এখন, ময়দানের এই শেষ সীমায়, শুধুই দুর্বোধ্য কতগুলো স্বরের ওঠানামা। সুবলের হাত ধরে মোহন ময়দান পার হয়ে আসে।

মোহনের কি এক রকম কৌতূহল, যেটা এখন অভ্যাসে পরিণত, যখনই কলকাতায় কোনো বড় মিছিল-মিটিংয়ে আসে—মিছিল-মিটিংয়ে তো তাকে প্রায়ই আসতে হয়—তখনই, নানা চেহারা, নানা মুখের মধ্যে সে তার দেশের মানুষকে খোঁজে—তার জন্মভূমি, তার ছোটবেলায় ফেলে আসা গ্রামের কোনো চেনা মানুষ। কবে তার প্রথম মিছিলে আসা, যেদিন থেকে তার এই অন্বেষণ, তা সে ভুলেই গেছে।

আজও ময়দানে ঢোকার মুখে যেখানটায় চলমান মিছিলগুলো এসে বিশাল ময়দানে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছিল—যেন সমুদ্রের বুকে নদীর মিশে যাওয়া—ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে মোহন পতাকা মিছিল মুখ মানুষ ইত্যাদি নিরিখ করছিল—যদি তার মধ্যে তার গ্রাম হাটিমারাকে খুঁজে পাওয়া যায়। মোহন অনেক বার ভেবেছে, তার

গ্রাম হাটিমারা, মহকুমা গড় ভবানীপুরের মানুষরা কি দাবি দাওয়া, আন্দোলন, লড়াই কিছুই করে না ? তা না-হলে মিছিলে তো কত জেলা, কত গ্রাম, কত মানুষ আসে, কই তাদের গ্রাম তো আসে না কখনো !

এবং আজও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এসব ভাবতে ভাবতে অস্বাভাবিকভাবে সে তার গ্রামকে আবিষ্কার করে ফেলে। মিছিল আর শূন্যে তুলে ধরা ফেস্টুনের গায়ে তার গ্রাম হাটিমারা চলিষ্ণু। ফেস্টুনটা কাছাকাছি আসতেই সে ফেস্টুনের পেছনে সারিবদ্ধ মানুষের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। হাঁটু তোলা কাপড আর কোর্তা গায়ে দেহাতি মানুষগুলো। একটু আগেই যেন খেতে ধুলো-মাটিতে কাজ করছিল। কাজ ফেলে এখন মিছিলে।

হাটিমারার মানুষগুলো মাঠের ভেতর ঢুকে দলবদ্ধভাবে এক জায়গায় জড়ো হয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলে। হাতের ফ্ল্যাগফেস্টুনগুলো গুটোতে থাকে। ওদের মধ্যে তুলনামূলক ধোপদুরস্ত, কাঁধে ব্যাগ মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে মোহন। লোকটা খুব চেনা চেনা। খুবই। বহু ঘনিষ্ঠ শৈশবস্মৃতির সঙ্গে মুখটা যেন লেপটে রয়েছে। কি নাম ওর, কি যেন নাম! সুধীর…সুরেন…সুবল। সুবল-ই তো !

দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত কিছু একটা পেয়ে যাওয়ার আনন্দে মোহন ঝটিতি দু'পা এগিয়ে এসে ওর কাঁধে হাতে রাখে। 'আরে সুবল না, সুবল সিকদার—'

লোকটা তাকিয়ে থাকে, দু-চোখে পরিপূর্ণ আকস্মিক বিস্ময় নিয়ে, এই প্যাণ্ট-সার্ট পরা শক্ত-সমর্থ বিজাতীয় চেহারার মানুষটার দিকে। এবং স্বীকার যায়, সে সুবল।

মোহন হঠাৎ দু-হাতে সুবলকে প্রায় বুকে আঁকড়ে ধরে। 'আমায় চিনতে পারছিস ? মোহন, মোহন গাইন, কেনারাম গাইনের ছেলে।

সেই হাটিমারা স্কুলে এক সাথে —তারপর পার বাকীসর ঝিলে মাছ ধরা—তুই তো একবার ডুবেই যাচ্ছিলি—মনে পড়ে।'

এভাবে ওদের পরিচয় লেনদেন হয়। তারপর মাঠ যখন লোকারণ্য, মিটিং বেশ জমে উঠেছে, তখন ওরা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

ওরা ধর্মতলার সারি সারি বাস টার্মিনাসগুলো পার হয়ে যায়। এসপ্ল্যানেডের প্রশস্ত রাস্তাটার গায়ে এসে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার পর এখন সুসজ্জিত দোকান আর রাস্তার উঁচু বাতি পোস্টের বৈদ্যুতিক আলোয় চারদিকে আলোর বন্যা। ও-ফুটে উঁচু বাড়ির ছাদে রঙিন নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন—'এভ্রি টাইম ইজ লিপটন টি টাইম'—জ্বলছে নিভছে। কলকাতা সুবলের কাছে এখনো দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়—কেমন যেন চোখ ধাঁধানো মন ধাঁধানো অনাত্মীয় ব্যাপার।

সামনে চওড়া রাস্তার অর্ধেকটা স্বচ্ছন্দে পার হয়ে ওরা রাস্তার মাঝখানে আসে। বাকি অর্ধেকটা সুবল তাড়াহুড়ো পার হতে গিয়ে একটা গাড়ির মুখোমুখি পড়ে। আর তখন, প্রায় দৌড়ে ও ফুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে একটা লোকের ঘাড়ে। লোকটা রেগে গিয়ে শাসায়—এই মারে কি সেই মারে। মোহন তখনও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। সামনে চলন্ত গাড়ির স্রোত থিতিয়ে আসলে ও রাস্তা পার হয়ে সুবলের কাছে আসে। লোকটাকে সরিয়ে দিয়ে সুবলকে টেনে নিয়ে যায়।

মোহন হো হো শব্দে হেসে ওঠে। 'ওভাবে রাস্তা পার হয়। সত্যিই তুই একটা গাঁইয়া!'

মোহনের এই 'গাঁইয়া' উচ্চারণ, যার মধ্যে কোন শ্লেষ বা ব্যঙ্গ ছিল না, বরং ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সহজ করে দেবার এক রকম চেষ্টা এবং ওর ঐ হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে ঘাড়ে পড়ার মধ্যে যে এক রকম গ্রাম্য সরলতা, তার প্রতি ভালোলাগার অভিব্যক্তিই ছিল। অথচ সুবলের অপ্রস্তুত ভাবটা যেন আরো বেড়ে যায়।

সুবল তো বড় একটা আসে না কলকাতায়। সেই বহু দিন আগে তা প্রায় বছরতিনেক তো হবেই, কলকাতায় এসেছিল নিমাই পাত্রর সঙ্গে—ট্রাক্টর কিনতে। আসার সময় রেলে চড়ে বাসে চড়ে এসেছিল। নিমাই পাত্রর পয়সায় এক রাত্রি শহরে থেকে হোটেলে খেয়ে পরের দিন ভোরে নতুন ট্রাক্টরে চেপে পাড়ি দিয়েছিল গ্রামে। সেই-ই। তারপর আজ এই মিছিলে।

ওরা ডান দিকের রাস্তায় বাঁক নিয়ে হেঁটে যায়। মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর, গ্রামের কি খবর বল—'

সুবল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মোহনের দিকে।

মোহনের অনেক টুকরো স্মৃতিই মনে জাগে—যেন সযত্নে বাক্স-বন্দী করে রেখে দেওয়া, কখনো-সখনো মনের বিস্তারে মেলে ধরা, আর তারিয়ে তারিয়ে হৃদয় দিয়ে অনুভব করা। সেই টালির চারচালা স্কুল ঘর, যার চারদিকে কৃষ্ণচূড়া গাছে এমন গ্রীষ্মের দিনে লাল ফুল ফুল ফুল···স্কুল বসার আগে সারিবদ্ধ ছাত্ররা—'জনগণমন অধিনায়ক···', মাটির মেঝেতে ডেস্কের সামনে মাস্টার মশাই চোখ বুজে আত্মস্থ, সামনে চাটাই বিছিয়ে ছাত্ররা, একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে পড়ছে আর সকলে সুর করে গলা মেলাচ্ছে—'জীবন আমার করো ফুলের মতন / জীবন আমার করো ফুলের মতন···'

'আচ্ছা সুবল, গ্রামের সেই স্কুলটা আছে, স্কুলটা—যেটাতে আমরা পড়তাম—'

'আছে। তবে আগের মতো সেই আর পাঠশালা নেই। এখন তিনতলা পাকাবাড়ি। সরকারি সাহায্য পায়। অনেক মাস্টার, অনেক ছাত্র।'

ওদের শৈশবের পাঠশালা এখন স্কুল—অনেক বড় স্কুল। অনেক ছাত্র পড়ে। ভাবতেও ভালো লাগে মোহনের।

সেই খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, যার নিচে শীর্ণ তিরতিরে

জলরেখা, দু-পারে উলু ঘাসের বন আর কলমি ফুল—'সুবল, সেই সাঁকোটা আছে—অজয় নদীর খালের ওপর বাঁশের সাঁকোটা ?'

সুবল হাসে, শিথিল ভঙ্গিতে। 'সে গ্রাম আর নেই। সবকিছু পাল্টে গেছে। খালের ওপর এখন সিমেন্টের পাকা ব্রিজ হয়েছে। পাকা সড়ক চলে গেছে আমাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে। আমাদের গ্রামে এখন বাস যায় স্টেশন থেকে।'

অনেক কিছু ভেঙেচুরে গেছে, অনেক কিছু নতুন হয়েছে। অথচ আশ্চর্য, শৈশবে দু-চোখ দিয়ে যা কিছু দেখেছে মোহন, তারই আমূল প্রতিচ্ছবি এখনো লালন করে চলেছে বুকের মধ্যে। ভালো-লাগা ছবিগুলো বাস্তবে যে পালটায়, পালটাতে পারে, তা সে ভাবেও নি।

'আচ্ছা, খুশু দত্তরা আছে, এখনো ?'

'খুশু দত্ত নেই। সে তো মারা গেছে অনেক দিন। তার জ্ঞাতি-গুষ্ঠী আছে কিছু। তবে আগেকার মতো সেই দাপট, সেসব আর নেই।'

'জমিদারি কি সব ভাগ হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সে তো হবেই। অনেক জমি খাস হয়েছে। তারপর বাকি যা ছিল, ভায়ে ভায়ে ভাগাভাগি। বিষয় সম্পত্তির বিবাদে এক ভাই আরেক ভাইকে তো গুলি করেই মেরে ফেললে। খুশু দত্তর এক মেয়ে, সে এক কেচ্ছা-কেলেঙ্কারি—বাড়ির চাকরের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত ঝিলের জলে ডুবে মরল মেয়েটা।'

মোহনের মনে পড়ে, চার বাহকের ঘাড়ে পালকিতে চেপে যাচ্ছেন খুশু দত্ত—দিনমানে জমিদারি দেখতে আর সন্ধ্যার মুখে বাগানবাড়ি। সামনে দু'জন সশস্ত্র টহলদার। রাস্তায় পথচারীরা দাঁড়িয়ে মাথা নত করে, 'পেন্নাম গো জমিদার বাবু!'

'গ্রামের এখন সবচেয়ে পয়সাওলা হল নিমাই পাত্ররা' সুবল বলে, 'পুব পাড়ার নিমাই পাত্র! অথচ ওর বাবা কি-না ছিল খুশু দত্তর

রায়ত। আর তার ছেলে সারের ডিলারশিপ বাগিয়েছে, তারপর পাম্প সেট, ট্রাক্টর ভাড়া খাটিয়ে পয়সা করে নিয়েছে খুব।'

সময়ের দোলনায় সবাই যেন ঘুরছে, বন্ বন্ নাগরদোলার মতো—আজ যে ওপরে কাল সে নিচে, আজ যে নিচে কাল সে ওপরে। ঘুরছে—সময় মানুষ জীবন পরিপার্শ্ব…

'তোদের সেই ঘরটা মনে পড়ে, যেটা তোরা ছেড়ে চলে এসেছিলি—'

এটাই তো জানতে চাইছিল মোহন প্রথম থেকে। অথচ কেমন যেন ভরসা পাচ্ছিল না। এটুকুও যদি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে হয়, সেই ভয়ে। তবু সুবলের মুখে হঠাৎ প্রসঙ্গটা ওঠায় ও যথেষ্ট উদগ্রীব হয়ে ওঠে—'হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ মনে আছে—বাড়িটা আছে এখনো?'

'না। তোরা যাবার পর মাটির ঘর আর জায়গাটা বিক্রি করে দিয়েছিল খুশু দত্ত। তোদের ঘর ভেঙে এখন পাকা বাড়ি।'

স্মৃতির পটে একটা দীর্ঘদিনের ছবি, সময়ের ব্যবধানে যা অনেক বেশি মূর্ত ও প্রত্যয়িত, অকস্মাৎ এমনভাবে মিথ্যা অবাস্তব ঘোষিত হওয়ায় বুকের মধ্যে হা হা শূন্যতা—এবং শূন্যতা ক্রমশ প্রলম্বিত হতে হতে হতে হতে হৃদয়কে উপর্যুপরি মন্থন করে মোচড় দেয়।

…গ্রামে দু'বছর অজন্মা আকাল। এক বছর খরা, এক বছর বানভাসি। মাঠচষা গরিব মানুষগুলোর পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ চলে যাচ্ছে শহরে, দুটো ভাতের জন্য অনিশ্চিত উদ্দেশ্যে।

বন্ধ দরজার চৌকাঠের ওপর মোহনের মা মাথা কুটছে আর কাঁদছে, 'ওগো এ শ্বশুর-শাশুড়ির ভিটে ফেলে আমায় কোথাকে নে চললে গো—'

একটা অনড় স্থবির বৃক্ষের মতো বাবা উঠানে দাঁড়িয়ে। বাবার চোখেও জল, টপ টপ গড়াচ্ছে মাটিতে।

'বাবা মোরা কোথাকে যাই?' মোহন তার বাবার হাতে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিল।

'শউরে বাপ।'

'সিখানে ভাত পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ বাপ।'

'পেট ভরি খাতি পাবো?'

'হ্যাঁ বাপ।'

তাহলে এ গ্রাম ছেড়ে যেতে এত দুঃখ, এত কান্না কেন, মোহন বুঝে উঠতে পারে না। এই জন্মভূমি, এই সেকেলে জীর্ণ ভিটেমাটি কিছু না দিক, অন্তত পরিচিতি ভালোবাসা দেয়, বাপ-ঠাকুর্দার স্মৃতি দেয়—তখনো তো এসব বোঝে নি মোহন, যেহেতু তখনও তার বোধ অপূর্ণ।

মোহনের খেয়াল হয়, ওরা কথা বলতে বলতে আর হাঁটতে হাঁটতে মাঠ ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছে।

হঠাৎ মোহন সুবলের হাত ধরে ফুটপাতের পাশে একটা রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে পড়ে। পর্দা-ঢাকা কেবিনের ভেতর একটা টেবিলের দুদিকে দুজন বসে। পর্দা সরিয়ে বেয়ারা ঢোকে। 'বলিয়ে সাব—'

'ক্যা খানা হ্যায়—'

'চপ কাটলেট ফিস ফ্রাই মাটন মোগলাই পরোটা…'

'কি বলিস, একটু ভালো করে খাওয়া যাক'—সুবলের দিকে তাকিয়ে মোহন বলে, এবং পরক্ষণেই সুবলের কোনোরকম উত্তরের তোয়াক্কা না করে বেয়ারার দিকে তাকিয়ে 'দো দো মোগলাই পরোটা আউর মাটন দো প্লেট—ফুল।'

বেয়ারা চলে যায়। বেয়ারার ধোপদুরস্ত রঙিন উর্দি এবং মাথায়

পেখমওলা টুপি ইত্যাদিতে ওকে সুবলের মনে হয় যাত্রাদলের অভিনেতা।

মোহন টেবিলের ওপর কয়েক ফোঁটা জমাট মোম নোখ দিয়ে খোঁটে আর খুঁটতে খুঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

…থুড়ো দত্তর হেপাজতে ওদের মাটির ঘর ভিটে বাঁধা রেখে ওরা চলে এল শহরে, সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে। বাবার তখনও শক্ত-সমর্থ মজবুত শরীর। মজুরের চাকরি নিল চটকলে। মাঝে মাঝে বাবা কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেত, তারপর হঠাৎ রেগে গিয়ে বলত, অনেকটা আপন মনেই, 'বেশ আছি. বেশ আছি শউরে। গেরামে মানুষি থাকে। মলে কি বাঁচলে কেউ দেখতিও এসবে নি। ছ্যাদা মালায় করি মুতবেও নি মুখে। শুধু হিংসে, হিংসেতে জ্বলি যায় সব—'

অথচ এসব কথায় বাবার ঠিক রাগ নয়, একরকম অনুযোগ আর চাপা বেদনা গুমরে গুমরে উঠত।

শহরে এসে মোহন একটা ছোটখাটো কারখানায় ওয়েল্ডিং-এর কাজ শিখছিল। বাবা মারা যাবার পর ঢুকে পড়ল মেটিয়াবুরুজের একটা বড় জাহাজ কারখানায়।

ফেলে আসা গ্রামের আকর্ষণ যে মোহনকে কতবার টনেছে। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আকর্ষণ আরো তীব্র হয়েছে। কিন্তু মোহন কেন যাবে, কোথায় যাবে—তার জন্মস্থান তো তাকে বুক দেয় নি, অন্ন দেয় নি, ভালোবাসা দেয় নি। অথবা একরকম আত্মধিক্কার—সে-ই তো ছেড়ে চলে এসেছে তার জন্মস্থানকে। নিদেন বেঁচে থাকার জন্য কোমল মাটির বুকভরা স্নেহ ছিন্ন করে তারাই তো চলে এসেছে শহরে। ইত্যাদি চিন্তা, ইত্যাদি অনুযোগ ভয় সংকোচের বাধা ঠেলে সে কখনোই যেতে পারে নি—অথচ তার সেই শৈশবের গ্রাম তো বেশি দূরে নয়। কলকাতা থেকে একটা ট্রেন আর ট্রেন থেকে নেমে মাইল আটেক হাঁটা পথ—এখন তো হাঁটতেও হয় না,

সুবল বলল, স্টেশন থেকে বাস চলে গেছে গ্রামে—সাকুল্যে ঘণ্টা-চারেকের পথ।

বেয়ারা টেবিলের ওপর খাবারের প্লেটগুলো নামিয়ে রাখে। সুবলের সঙ্গে দেখা হবার পর মোহনের মনে যে অদ্ভুত ভালোলাগা এক অনুরণন সৃষ্টি করেছিল, হঠাৎ তা আলগা হয়ে ফলত ওদের মধ্যে এক অস্বস্তিকর মৌন পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা বুঝতে পেরে মোহন আবার স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। সুবলের দিকে তুটো প্লেট বাড়িয়ে দেয়, 'নে খা—'

খেতে খেতে মোহন জিজ্ঞাসা করে, 'তুই কি কৃষক আন্দোলন-টান্দোলন…'

সুবল মুখ তোলে। খাবার-ভর্তি মুখে একটা অস্ফুট উত্তর দেয়, যার অর্থ হ্যাঁ অথবা না তুই-ই হয়।

কৃষক আন্দোলন, তা করি বটে—মনে মনে ভাবে সুবল—আমাদের নিমাই পাত্তর, সারের হোলসেলার, ট্রাক্টর, পাম্প সেটের মালিক, সে ব্যাটাও তো কৃষক আন্দোলন করে, রাজনীতি করে। তবে হাওয়া বোঝে নিমাই পাত্তর। যার যখন হাওয়া, নিমাই পাত্তরও পাল তুলে দেয় সেদিকে। যখন লাল ঝাণ্ডা তখন লাল ঝাণ্ডা, যখন তেরঙ্গা তখন তেরঙ্গা। নিমাই পাত্তর বলে মাঝে মাঝে, 'তোর দ্বারায় কিছু হবে না সুবল। ঐ সাবডিভিশন কোর্টে মোহুরিগিরি করেই জীবন কাবার হয়ে যাবে তোর। লাইন ধর, লাইন!'

তা অনেক ভেবেচিন্তে সুবলও লাইন ধরল। কিছুদিন ঘুরল বিষ্টু হাজরার পিছু পিছু। বিষ্টু হাজরার কথায় কিছু লোক নিয়ে ঘেরাও করে দিল বি ডি ও অফিস। বাস, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে পঞ্চায়েত মেম্বর। কিছু দিন বাদে গোবিন্দপুরে পঞ্চাশ বিঘে জমি খাস হল। সুবল বাগিয়ে নিল বিঘে পাঁচেক। তা লাইন ভালো, গ্রামের লোক মান্যগণ্যও করে। 'সুবল আমাদের লেত্তা হইচে গ। তা বলেন

সুবলবাবু দ্যাশের খপর-সপর কি?' 'আমি কি দিল্লীর মেম্বর, না বিধানসভার—দেশের হালচাল বলবো!' 'তাতে কি হল, আপনে তো পলিটিস করেন গ বাবু!'

বেয়ারা বিল দিয়ে গেল। মোহন হাত বাড়িয়ে 'কত?' 'পনের পঞ্চাশ!'

'প-নে-র পঞ্চাশ!' আকস্মিক বিস্ময়ে সুবলের গলার স্বর বড় বেমানান শোনায়। সুবল বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগে দেখে, মোহন পকেট থেকে টাকা বের করে বিল মিটিয়ে দিয়েছে। এইটুকু খাবার, পেটের এক কোণায় পড়ে রইল, তাতেই পনের টাকা পঞ্চাশ। এতে তো সংসারে এক সপ্তাহের মশলা খরচ কুলিয়ে যায়। কেমন নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে মোহন টাকাগুলো বের করে দিল, অথচ টাকাগুলো বেরিয়ে গেল যেন সুবলের বুকটা ফুটো করে দিয়ে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা আবার রাস্তায় নামে; ফেরতা পথে ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে। মোহন বলে, 'এবার ময়দানের দিকে যাবি তো?'

'একটা শাড়ি কিনব ভাবছিলাম' সুবল বলে।

'শাড়ি? কার জন্য, বৌয়ের—'

একটা ভালো শাড়ি বৌটার অনেক দিনের সাধ। আর সত্যি বলতে কি, বিয়ে তো হল অনেকদিন, বৌটাকে কখনো ভালোমন্দ কিছু দিই নি। বৌটাও সুযোগ পেলে খোঁটা দেয়, 'কি দিলে আমাকে! সারা জেবন শুধু তোমার হাড়িঘরকন্যে সামলাও। জেবনে সখ আহ্লাদ নেই বুঝি কুনো—'

দিতে তো সুবলেরও মন চায়। বৌ বলে কথা! কিন্তু গেরো পয়সায়। আজকাল যা বাজার, একটা সাদামাটা তাঁতের কাপড়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, তার ওপর শৌখিন কাপড়—একশ টাকার কম নয়! এত-গুলো টাকা বের করতে হবে, ভাবলেও বুক চুপসে যায়।

তবে এবার মিছিলে আসার আগে সুবল স্থির করে ফেলেছে. একটা শৌখিন শাড়ি কিনে নিয়ে যাবে শহর থেকে। বৌটার উঠতে বসতে মুখ নাড়া আর সহ্য হয় না।

একটা আলো-ঝলমল দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ে ওরা। শাড়ির কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াতেই দোকানের লোকটা শোকেস থেকে পাঁচ ডজন কাপড় বের করে মেলে দেয় ওদের সামনে। নানা ধরন, নানা রঙের এতগুলো শাড়ির মধ্যে কোনটা যে পছন্দ করবে, সুবল ভেবে পায় না। দোকানদার লোকটা একটা কাপড় দেখিয়ে বলে, 'এটা নিন। জিনিসটা ভালো, চলছে খুব।'

ফিকে লাল সিনথেটিক জমির ওপর হরেক রকমের প্রিণ্ট। 'এটা কেমন মানাবে?' মোহনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে সুবল। মোহন সজোরে হেসে ওঠে, 'আমি কি করে বলব, আমি কি দেখেছি তোর বৌকে?' সুবলের কাছে সব কাপড় ভালো, এটাও ভালো। তবে কাপড়টা পরে বের হলে প্রতিবেশী পাঁচটা বৌ চোখ টেরিয়ে দেখবে। 'কি কাপড় কিনেছে লো তোর সোয়ামি। তোকে যা মাইনেছে মাইরি···'

'কত দাম?' সংযত স্বরে জিজ্ঞাসা করে সুবল।

'একশ ত্রিশ টাকা।'

সুবলের জিবটা যেন আস্তে আস্তে গলায় নেবে যেতে থাকে। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বিধ্বস্ত হয়ে যায় এক মুহূর্তে। একশ তিরিশ, বাপুরে! কাপড়টা স্পর্শ করতেও ওর যেন আর সাহস কুলায় না। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে হাতের চেটো চুলকাতে দেখে মোহন বলে, 'কিনবি না কাপড়টা?' 'যা দাম···' 'কেন, অত টাকা নেই তোর কাছে?' সুবল মাথা নাড়ে। 'কত আছে?' 'গোটা-সত্তর হবে।' মোহন প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাইনের প্যাকেটটা বের করে। মাসিক প্রডাকসন বোনাসের টাকাগুলো আজই পেয়েছে। এর থেকে টাকা দেওয়া, যদিও

তাকে সারা মাস টানাটানিতে পড়তে হবে, তা হোক—বন্ধু তো, ছোট বেলাকার বন্ধু তো, তার জন্য ষাটটা টাকা খরচ করা, না করলে যখন বৌয়ের জন্য শখের কাপড়টা কেনা হবে না, তখন কিছুই নয়।

মোহন পঞ্চাশ টাকা আর দশ টাকার দুটো কড়কড়ে নোট সুবলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। সুবল কাপড়টা কেনে। কাপড়ের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ওরা বেরিয়ে আসে।

ফুটপাত ধরে যেতে যেতে সুবল সন্তর্পণে জামা সরিয়ে নাভি কুণ্ডলির নিচে কাপড়ের বন্ধনীতে হাত দেয়। ট্যাঁকে গচ্ছিত এক তাড়া নোট হাতে ঠেকে, এবং এক রকম নিরাপদ অক্লেদ সুখ অনুভব করে বুকের মধ্যে।

খরচ মানে তো খরচই। মানে বুকটাকে শূন্য করে দেওয়া। অথচ খরচ না করে শুধুই স্পর্শে, অনুভবে, নাড়াচাড়ায় এক রকম সুখ আছে। পরিপূর্ণ সুখ।

কোণে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে মহিলাটি বসে—মাঝবয়সি, এবং নিরাভরণ, প্রসাধনশূন্য। পরণে পাড়ওলা সাদা খোলের কাপড়, কব্জিতে পুরুষালি ঘড়ি, চোখে সরু রিমের চশমা ইত্যাদিতে বেশ এক রকম অনুত্তেজ আভিজাত্য। মহিলাটির টেবিলের সামনে এসে লাইনের গাঁথুনি খসছে, একটা-একটা করে। বাঁদিকে একটা ছোট পার্টিশান, যার গা দিয়ে লাইনটা, ছোটই, বেরিয়ে গেছে। লাইনে দাঁড়ানোর হাত দেড় প্যাসেজ। প্যাসেজের দু-পাশে সারি সারি টেবিল-চেয়ার, সুবিন্যস্ত। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়া মনস্ক কয়েকটা মাথা। টেবিলে টাইপ রাইটার এবং তার ওপর আঙুলের দুরন্ত আস্ফালন, টগবগে ঘোড়ার মতো—খট খট। টেবিলে খাতা, পিন কুশন, পেপার ওয়েট, অ্যাশট্রে, কাগজ, খালি গ্লাস। মাথার ওপর ঝুলন্ত পাখার তিন ব্লেডের চক্রাবর্তে ক্যাঁচ ক্যাঁচ। দেয়ালের লম্বা র‍্যাকে থাক থাক পুরনো ফাইল, ধুলোর আস্তরণে ঢাকা।

এটা একটা অফিস—বিবাহ যোগাযোগের, যারা মাঝেমধ্যে কাগজে আর জনবহুল রাস্তার বোর্ডিং-এ বিজ্ঞাপনী প্রচার দেয়—আমরা অমুক মাসে এতগুলো বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর বিবাহ দিয়েছি। বিবাহযোগ্য পাত্রপাত্রীর অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেই, সম্পাদিকা সংযোগকেন্দ্র।

ঝুমুরের সামনে আর দু-জন—প্রৌঢ়, এবং দুজন খসলেই ঝুমুর চেয়ারে বসা মহিলাটির মুখোমুখী—সময়ের ব্যবধানে যা পাঁচ-সাত মিনিট। সুতরাং ঝুমুর ব্যাগের চেন টেনে কার্ডটা বের করে রাখে। সামনে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির চালশে পড়া দু-চোখের দৃষ্টিতে কঠিন নির্লিপ্ত। যেন পৃথিবীর যাবতীয় কিছুর প্রতি তিনি আস্থা ও মোহহীন।

প্রথমজন খসলেন। ঝুমুরের সামনে আর একজন। প্রৌঢ় লোকটি মহার্ঘ সম্পদের মতো সযত্নে কার্ডটা বুক পকেট থেকে বের করে মহিলাটির সামনে ধরলেন। মহিলাটি কার্ডের নম্বর দেখে খাত উলটিয়ে বলেন, 'চার মাসের চল্লিশ টাকা।'

প্রৌঢ় লোকটি টাকাগুলো কয়েকবার গুনে বাড়িয়ে দিতে দিতে, 'খবর তো পাচ্ছি না কিছু—'

'একটা তো পেয়েছেন।'

'গতবার টাকা জমা দেবার সময়, তখনও বলেছিলেন, কিন্তু—'

'এবার পাবেন। বাড়িতে চিঠি যাবে।'

প্রৌঢ় লোকটি বলে চললেন, আরো অনেক কিছু। কিন্তু মহিলাটি না-শোনার ভান করে এমন নিশ্চুপ. লোকটি বাধ্য হলেন লাইন থেকে সরে দাঁড়াতে।

এবার ঝুমুরের পালা। ঝুমুর কার্ডটি এগিয়ে দেয়। মহিলাটি কার্ড আর খাতা মিলিয়ে নামটা বের করেন। খাতার ওপর থেকে মুখ না-তুলেই বলেন, 'আপনার তিরিশ টাকা—তিন মাসের।'

ঝুমুর টাকাটা বাড়িয়ে দেয়। ঝুমুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন—যেন কপাল দেখে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী—'আপনি খবর পাবেন, খুব শিগগির।'

ঝুমুর ভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু পারে না। এখনো কেমন যেন সংকোচ দ্বিধা। এবং লাইন থেকে বেরিয়ে আসে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝুমুর, বাইরে আসতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চকিত বিস্ময়ে, লাইনে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে—'কেতকী না?'

মেয়েটির মুখেও একই রকম অভিব্যক্তি—বিস্ময়ের কৌতূহলের, এবং পাল্টা প্রশ্ন, 'তুই ঝুমুর না?' কয়েকবার পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি। তারপর হাসে, দুজনে, একসঙ্গে, একই ভঙ্গিতে। বুঝে নেয় অনুমান ঠিক, দুজনেরই।

'তুই এখানে?' ঝুমুর জিজ্ঞাসা করে।

কেতকী ঠিক একই প্রশ্ন ওকে ফিরিয়ে দেয়, আর একটু জোর দিয়ে 'তুই এখানে?' এবং এই প্রশ্ন চালাচালির মধ্য থেকে উত্তর সন্ধান হয়ে যায় ওদের, যদিও উত্তর দেওয়াটাই এখানে অবান্তর, যেখানে উপস্থিতিই উদ্দেশ্য নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

কেতকী বলে, 'তোর হয়ে গেছে তো, দাঁড়া একটু।'

লাইন তেমন বড় নয়, জন-কুড়ির, যার মধ্যে মহিলা ওরা দুজন। বাকি সকলে পুরুষ—প্রৌঢ় নতুবা বয়ঃবৃদ্ধ, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সামনে টাক কমবেশি, মুখ ভাঙাচোরা নৈর্ব্যক্তিক—এবং অভ্রান্ত অনুমানে যারা কমবেশি অজীর্ণ পিত্ত কোষ্ঠকাঠিন্য শ্বাসকাশ রোগে আক্রান্ত ছাপোষা মধ্যবিত্ত—সর্বোপরি কন্যাদায়গ্রস্ত।

কেতকী পৌঁছে গেছে সেই মহিলাটির সামনে। কথাও বলছে সহজ ভাবে। হাসল একবার। লাইন থেকে বেরিয়ে এল।

ওরা দুজন বাইরে আসে। বের হওয়ার দরজাটার পাশে, একটা হাফ রাউণ্ড টেবিলের ওদিকে বসে থাকা সুখী সুশ্রী মহিলাটি, যার সিঁথিতে বিবাহিতের সদর্প নিশান, ফোনে কথা বলতে বলতে ওদের দিকে তাকান। নিচে নামার কাঠের সেকেলে সিঁড়ি। পা ফেলার শব্দ হয় খট খট।

কেতকী বলে, 'কতদিন পরে দেখা বলত!'

'অ-নে-ক দিন।'

'সেই কলেজে থাকতে—'

'তা প্রায় আট-ন বছর হবে, হবে না ?

'তা হবে।'

ওরা রাস্তায় নামে। ঝুমুর জিজ্ঞাসা করে, 'কি করছিস তুই, এখন ?'

'কি আর করব ! চাকরির লাইন থেকে আউট, এখন বিয়ের লাইনে—'

কেতকীর কথায় ঝুমুর হেসে ওঠে, সজোরে। এবং হাসতে হাসতে হঠাৎ, হাসি যখন উচ্চগ্রামে, থেমে যায়। ঝুমুর নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না, এ হাসি ওর, ওরই কণ্ঠনিসৃত কি-না। এমন নির্বাধ খোলামেলা হাসি কতদিন যে হাসে নি, হাসতে পারে নি—যেন হাসতে ভুলেই গেছে ঝুমুর।

সেই কলেজে থাকতে, অফ পিরিয়ডে, না-হয় ক্লাস ফাঁকি দিয়ে, রাস্তায়, পার্কে, ক্যাণ্টিনে, কমনরুমে··· ।

ডালহৌসি থেকে গ্রেট ইস্টার্নের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে এসপ্লানেডে, সে রাস্তার ওপর ওরা ওঠে। ফুটপাত ধরে চলায় এক রকম আভিজাত্য খুঁজে পায় ঝুমুর। রাস্তার দু-পাশে এই যে উঁচু উঁচু বাড়ি, ঝকঝকে দোকানের শো-কেসে হরেক পণ্য, মানুষের যাতায়াত—এবং ছুটন্ত গাড়ি-ট্রাম-ট্যাক্সি-মিনির, ক্রসিং-এর মাঝখানে সমকোণে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিস ইত্যাদি যাবতীয় ঝুমুরের দৃষ্টিতে ধরা দেয় এক নতুন পরিপ্রেক্ষিতে। ডান দিকে, রাস্তার ও-ফুটে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের আঠার তলা বাড়িটা এইমাত্র যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগেও ও-ফুট ধরে এসেছে ঝুমুর। তখন কি বাড়িটা ওখানে ছিল না ?

ট্রামটা এত আস্তে গা মুচড়ে মুচড়ে চলে, এতটা সময় ধরে, যে ঝুমুরকে ভেবে ফেলতে হয় যেন একটা অজগর, পেট পুরে খেয়েদেয়ে

চলেছে, কায়ক্লেশে হেলেদুলে। অথবা কোমর ভাঙা বৃদ্ধ—লাঠি হাতে ঠুক ঠুক।

ডান-হাতি সামান্য হেঁটে ওরা পৌঁছয় চৌরাস্তার সামনে। তারপর সেটা কোণাকুনি পার হয়ে ওঠে রাজ ভবনের পরিসীমায় লম্বা রেলিং-ঘেঁষা ফুটপাতের ওপর। ফুটপাত ধরে ওরা পশ্চিমে এগোয়।

ঝুমুর বলে, 'আমাদের সেই বৈশাখী-অণিমা, তারপর কি নাম যেন, বেহালার ও দিক থেকে—'

'অঞ্জলি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা এখন কি করছে রে?'

'বৈশাখীর খবর ঠিক বলতে পারব না। তবে অণিমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিছুদিন আগে।'

'তাই নাকি! কি করছে?'

'কিছুই নয়। ঘরে বসে বেকার ভাতা, পঞ্চাশ টাকা—ব্যস। চেহারাও খারাপ হয়ে গেছে। আমি তো চিনতেই পারি নি প্রথমে।'

'বিয়ে-টিয়ে?'

'না। ফুল ফটে নি এখনো।'

ঝুমুর হাসে। 'তুই কিন্তু একই রকম রয়ে গেছিস।'

হাসতে হাসতে কেতকী, 'তা তুই কি বলিস আমি পাল্টাব! তোমরা পাল্টাও বাবা। আমি যা তাই—চিরকাল।'

'আর অঞ্জলির খবর?' ঝুমুর জিজ্ঞাসা করে।

'ওর খবর ভালো।'

'কি রকম?'

'বিয়ে করেছে।'

'আচ্ছা!'

'পাঞ্জাবি। সর্দারজি।'

'সে কি রে?'

'আরে, এখন তো ঐ দিকেই কেরিয়ার। বাঙালি মেয়েদের ডিম্যাণ্ড আছে—সর্দারজি, গুজরাটি। মেড্রাও নাকি লাইনে আসছে। একটু গান জানতে হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত।'

'সে না হয় কোথাও শিখে নেওয়া যায়। কিন্তু ইংরেজি তো লাগে—'

'স্পোকেন ইংলিশ…। কিন্তু যা কম্পিটিসান মার্কেট বাবা !'

ঝুমুর এবারও হেসে ফেলে।

'আচ্ছা ঝুমুর, তোর লুম্বিনীকে মনে পড়ে ?'

'লুম্বিনী · না তো।'

'আরে সেই মেয়েটা—চানাচুরের ইংরেজি ডালমুট ! সেই ইংরেজি প্রফেসার, কি নাম যেন, তাঁর ক্লাসে চানাচুর খেতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। তারপর চানাচুরের ইংরাজি কি, না ডালমুট—মনে নেই তোর ?'

'ওঃ হোঃ, যাকে আমরা নিতম্বিনী নাম দিয়েছিলাম, ইয়া পেছন যার !'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ধরেছিস। ও চাকরি করছে ব্যাঙ্কে।'

'ব্যাঙ্কে ? কী করে পেল ?'

'চাচা-ভাতিজার ব্যাপার !'

'মানে ?'

'ক্যাচ আছে।'

'কিন্তু ও-তো আমরা বেরিয়ে যাবার পরও পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করতে পারে নি। চাকরি পেয়ে গেল ?'

'শুধু চাকরি নয়, বিয়েও করেছে। ব্যাঙ্কেরই একজনকে।'

'বা-বাঃ এতো হরিয়ানা লটারি। একেবারে বাম্পার ড্র। ব্যাঙ্কে চাকরি আবার ব্যাঙ্কে চাকরিঅলা স্বামী। ব্যাঙ্কের চাকরিরই তো এখনও ডিমাণ্ড বেশি…'

'প্রাইভেট ফার্মের আরো বেশি। আমি তো দেখলাম, সাত-আট বছর তো হবেই—কম্পিটিশন মাস্টার, জেনারেল নলেজ, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, এপ্লিকেশন, ইনটারভিউ—এসব দিয়ে কিছু হয় না। তোর সোর্স থাকলে চাকরি হবে। চাকরি হলে বিয়ে হবে। আজকাল সব ছেলেই চাকরিওলা মেয়ে চায়।

যেমন হয়, তেমনি করে হঠাৎ ওদের কথা থেমে গেল। আর ঝুমুর যেন হঠাতই টের পায় এই হাসিঠাট্টার মধ্যে কখন এক সময় সে হিসেব-নিকেশ শুরু করে দিয়েছে নিজেরই আড়ালে। অন্যের সাফল্যের পরিমাপে নিজের ব্যর্থতার সেই যাচাইয়ে ঝুমুরের ব্যর্থতার বোঝা কখন বেড়ে যায়। ব্যর্থ হতে মানুষ ভয় পায় না। কিন্তু নিজের ব্যর্থতা নিয়ে অন্যের বড়ত্ব মাপার কাঠি হতে কেউই চায় না, ঝুমুরও না।

রাজ ভবনের পরিসীমা সংলগ্ন এই ফুটপাত এবং রাস্তাটা রাজ-ভবনের চৌহদ্দি শেষে উত্তরে জি-পি-ও-র গা থেকে বেরিয়ে আসা একটা রাস্তাকে ছেদ করেছে, যে ব্যবচ্ছেদ বড় আকারের একটা যোগ চিহ্ন। ওরা এই সাময়িক ছেদ অতিক্রম করে আবার ফুটপাত ধরে। ফুটপাতে চলমান মানুষ—ঘরফেরা। ফুটপাত সংলগ্ন অফিস, দোকান—বিশাল প্রটেকটেড গ্লাসের ভেতর মোটর ভেহিকল, সাম্প্রতিক মডেলের, এবং তারই নিচে অন্ধকার কানা ঘুপসির ভেতর গনগনে আঁচে টগবগে জলের কেটলি, বিস্কুটের বোয়েম, মাটির ভাঁড়। এই রাস্তা পেরতে পেরতে একটু দেখতে দেখতে ঝুমুর কেমন করে ভুলে যায় সামান্য কয়েক মুহূর্ত আগের বিরক্তি। কিন্তু বিষাদটা থেকে যায়। যেন ঝুমুরকে এমন কিছু হয়ে যেতে হয়েছে যা হওয়াতে তার কোনো ভূমিকা নেই।

চলতে চলতে কতকী বলে, 'তোর সাগরিকাকে মনে পড়ে?'

'খু-উ-ব। ওকে মনে থাকবে না, আমাদের ব্যাচের জিনিয়াস!'

'ও মারা গেছে।'

'মানে?'

'সুইসাইড।'

'সুইসাইড?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে কি হয়েছিল! তারপর টিউসানি করতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে আর ফেরে নি। পরের দিন লাস পাওয়া গেল দমদম স্টেশন থেকে কিছুটা দূরে, লাইনে, কাটা।'

'ই-স-স' ঝুমুর যেন আঁতকে উঠল মর্মান্তিক বেদনায়, অথবা আকস্মিক করাল ভবিষ্যৎ চাক্ষুষ করে ফেলে, 'কেন যে মরল—'

প্রশ্নটা কেতকীর মুখেও প্রতি-উচ্চারিত, যেটা একটা ধাঁধার মতো, যার সঠিক উত্তর প্রকাশ করতে ওরা পারে না, কিন্তু উত্তরটা কি, বুদ্ধি চেতনায় আপাত একটা ছায়ার মতো উপলব্ধি করতে পারে। একটু আগেও এই ফুটপাত ধরে হাঁটা—নিছক হেঁটে চলা, আর কথা বলার মধ্যে যে অর্থ খুঁজে পাচ্ছিল, যা জীবনের দৈনন্দিনতায় এক ঝলক ব্যতিক্রম, তাও হঠাৎ নিঃশেষ হয়ে যায়।

ওদের হেঁটে আসা ফুটপাত এবং ফুটপাত সংলগ্ন রাস্তা এখন মিশেছে আড়াআড়ি চলে যাওয়া স্ট্রাণ্ড রোডের সঙ্গে, যার ও-প্রান্তে উঁচু হোর্ডিং-এর বিজ্ঞাপন দূর থেকেও চোখে পড়ে—ব্লাড ব্যাঙ্কের—বাঙালিরা রক্তদানে পিছিয়ে কেন? তার গায়েই দীর্ঘ পাঁচিল। পাঁচিলের ও-প্রান্তে পোর্ট কমিশনারের গুদাম, আদ্যিকালের, ভাঙা-চোরা অকেজো। বাঁ-দিকে রাস্তার বাঁকে নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং আকাশ ছোঁয়।

কেতকী বলে, 'তোর কি তাড়া আছে বাড়ি ফেরার?'

'কেন?'

'তা হলে চ গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি।'

'চ।'

ওরা বাঁয়ে বাঁক নেয়। আউটরাম ফেরি ঘাট পার হয়। ইডেন ছাড়িয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছায়। একটা সান বাঁধানো বেদির ওপর দুজনে বসে। আরো অনেকে বসে ছাড়া ছাড়া দূরত্বে।

বিকাল পড়ন্ত। সম্মুখে খোলামেলা। মাথার ওপর আকাশের নীল থোক থোক সাদা মেঘের বাহার। নিচে নদীর জলে বহতা, পাড়ে জলের ছলছল। বাঁ-দিকে কিনারা ঘেঁষে নোঙর করা কয়েকটি জাহাজ। জাহাজে ঘর, মাস্তুল, ক্রেন, পুতুলের মতো মানুষ, ঘুরে বেড়ান। নদীর ওপারে টানা কারখানার সেড, ঢেউ খেলানো চালা—যেন অনুচ্চ পাহাড় চড়াই-উৎরাই মাথায় নিয়ে। শূন্যে ইতস্তত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য চিমনি, মাথামোড়া তাল গাছের মতো। সে সবের কোন ফাঁকফোকরে বেলা শেষের সূর্য আত্মগোপন সন্ধানী, আর তার ম্লান কমলা রশ্মি নদীর জলে অপার শূন্যতায় ভেঙে অণুতে অণুতে একাকার। এক ঝাঁক গাঙচিল পাখায় সে রশ্মি মেখে উড়ে যায় দিগন্তে, দূরবিস্তারে। মাঝ গঙ্গায় একটা নৌকো—পালতোলা, নৌকোয় এমপ্লিফায়ার, নৌকোয় একদল মেয়ে আর ছেলে—নাচছে, ভাঙছে, দুলছে এমপ্লিফায়ারের সুরেলা ধ্বনির তালে তালে। এবং স্ফূর্তির তুঙ্গে আকস্মিক শূন্যতায় ছুঁড়ে দিচ্ছে মিলিত ধ্বনি, যার বিলীয়মান রেশ আছড়ে পড়ছে এই কিনারে। নোঙর-করা একটা জাহাজ সমগ্র পরিবেশকে তটস্থ করে দিয়ে রাশভারি গম্ভীর গলায় ডাক ছাড়ল, 'ভোঁ-ওঁ-ওঁ-ওঁ...'

এই গা-এলানো পড়ন্ত বিকাল, অস্তাচল সূর্যের এই নিষ্প্রভ রশ্মি, নদীর প্রেক্ষিতে এই বিশাল মৌন পরিবেশ, তার মাঝে বিক্ষিপ্ত কিছু শব্দ—জীবনের, যন্ত্রের—জাহাজের ঐ আকস্মিক থেমে থেমে রাশ ভারি স্বর ইত্যাদি ঝুমুরের নিরবলম্বতাকে আরো প্রকট করে। কিছু ব্যথিত স্মৃতি, যেন সূচ ফুটিয়ে রক্তক্ষরণ, চুইয়ে চুইয়ে...

…দুপুর। হাসপাতালের দীর্ঘ করিডর। শূন্য। নিচে কংক্রিটের রাস্তায় আলত বাতাস টেনে নিয়ে যায় শালপাতার ঠোঙা খ-স্-স্-স্। আটচল্লিশ নম্বর বেডে বাবার দেহ। বাঁ-হাতের শিরায় স্যালাইনের সূচ। নাকে অক্সিজেনের নল। শিয়রে দাদারা। নার্স বলে গেল, শেষ জলটুকু দিয়ে দিন মুখে। ঝুমুরের অসহায় দুটি হাত রেলিং আঁকড়ে ধরা। দেবদারুর ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে মধ্যাহ্ন সূর্যের দৃপ্ত আলোক। দূর আকাশের কোলে মেঘের আড়ালে একক চিল পাখসাট খায়। বাতাসে শাল পাতার ঠোঙা খ-স্-স্-স্…। বাবার দেহটা সাদা কাপড়ে ঢেকে দিল ওয়ার্ড বয়।

…মেঝেতে ফরাস পাতা। ঝুমুর বসে। হাঁটু দুটো সামনে দিকে মুড়ে। বিনম্র, বিনয়ী, লাজুক ইত্যাদি মেয়েলি গুণের প্রতিমূর্তি সেজে। তিন দিক থেকে তিন জোড়া চোখ, নিরক্ষণী দৃষ্টি, ঝুমুরের আপাদমস্তকে।

—তোমার বয়স কত মা ?

—পঁচিশ বছর।

(পঁচিশ, এত কম ? অবশ্য যা সেজেছিল ! তাতে পঁচিশ-ই। কিন্তু চুলগুলো টান টান করে বাঁধলেই দুদিক ফাঁকা। তোর পঁচিশ —বিয়ের বাজারে। স্কুল সার্টিফিকেটে ছাব্বিশ। আর জন্ম নিয়েছিলি একদা আটাশ বছর তিন মাস কয়েকদিন আগে। এত করেও তোর বাজার দর শূন্য)।

—কত পর্যন্ত লেখাপড়া করেছ ?

—বি এ।

—রান্নাবান্না ঘরের কাজ

—জানি।

বড় বৌদি বলে, ঝুমি, তুমি রান্নাটা সেরে নাও। আমার শরীরটা আজ কেমন যেন…। মেজ বৌদি বলে, ঝুমি, টুটুলকে নিয়ে এস তো স্কুল থেকে। আমার একটু কাজ আছে। সেজ বৌদি বলে, এখনো ভাত হল না। সাড়ে দশটা বেজে গেল কখন। চলে না এভাবে!

সারা বেলা হাঁড়ি আর হেঁসেলের সঙ্গে কসরতের পর এখন মধ্যদুপুরে ক্লান্ত অবসন্ন। মাজায় শিরশিরানি ব্যথা, শিরদাঁড়া বেয়ে ঘাড় পর্যন্ত। ব্যথায় ভেঙে পড়া ভারি মাথাটা টেবিলের ওপর। মাথায় একটা শুক হাতের অভয়স্পর্শ—সহানুভূতির। ঝুমুর ঘুরে তাকায়, মা।

—ঝুমি, মা, তোর বড় কষ্ট রে! মায়ের কণ্ঠে অসহায় সমবেদনা।

ঝুমুরের বুক ভারি হয়ে ওঠে ব্যথায়, চোখ দুটো অশ্রুতে।

—তুই সারাদিন কেন খেটে মরিস। ওরা তো তোর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিতে পারলে খালাস। তুই কেন এত খাটবি, এটা কি তোর সংসার মা!

মায়ের বুকে শ্বাসপাত দীর্ঘায়ত।

—তোর একটা হিল্লে হল না রে। ওরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তোর বাবা যদি আজ বেঁচে থাকত!

…পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁ। ছেলে আধুনিক। কনে দেখা চলবে না। দাদা কোনোদিনও পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় যায়নি। ঝুমুর পার্ক স্ট্রিট কোনোদিন গেছে বলেই মনে পড়ে না। সাজা চলবে না! নাকি সাজা বোঝা গেলে চলবে না। মেজ বৌদির বোনের ননদ খুব নাকি এরকম সাজতে পারে। তাদের বাড়িতে যেতে হল। শেষে দাদার সাহসে আর কুলোল না। মালাকেও সঙ্গে নিল।

রেস্তোরাঁয় আলো এত কম, কিছু দেখা যায় না। লোক এত বেশি কিছু বোঝা যায় না। সবাইকে কেমন ছায়া ছায়া দেখায়। ধীরে ধীরে চাপা গোলমাল স্পষ্ট হয়, স্পষ্ট হতে হতে মাথায় ওঠে। টেবিলে কয়েকজন লোক। কে-যে-কি কিছুই বুঝতে পারে না ঝুমুর। খাবার আসে। মালা কথা বলছিল ওদের সঙ্গে। দাদা আর ঝুমুর একাবারেই বিহ্বল চুপ। আর, সেই আধো অন্ধকারে, আধো আলোতে, আবছায়ায়, সেই চাপা প্রবল গোলমালের ভেতর টেবিল ঘেরা যুবকদের কে যে দেখছে তাকে, ঝুমুর বুঝতে পারে না। কিন্তু আরো কিছুক্ষণ পর এক সময় ঝুমুর বুঝে ফেলে ওরা মালাকেই ঝুমুর ভাবছে। আর সেটা বুঝে ফেলার পর ঝুমুর তার চেয়ারটা আর একটু পেছিয়ে নিয়ে সিনেমা দেখার মতো দেখে—মালা কেমন ঝুমুর হয়ে গেছে। আর এত কিছুর পরও ঝুমুর কেমন ঝুমুরই থেকে যায়।

ঝুমুর কেতকীর দিকে ধীরে মুখ তুলে তাকায় আত্মগত দৃষ্টিতে। বুক নিংড়ে বেরিয়ে আসে বেদনার্ত শ্বাস। তারপর বলে, স্বগতোক্তির মতো, 'আমাদের দ্বারা কিছু হল না। না লেখাপড়া ভালো করে, না চাকরি, না বিয়ে।'

হঠাৎ কেতকী হেসে ওঠে, বাতাস কাঁপিয়ে, সজোরে, সে হাসিতে আকৃষ্ট হয়ে তফাতে বসে থাকা কয়েকজন সকৌতূক দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। হাসতে হাসতে কেতকী সামান্য স্বর নামিয়ে বলে, 'তোর বিয়ের খুব শখ। আমি ব্যাটাছেলে হলে এক্ষুনি তোর গলায় মালা দিয়ে বিছানায় ঝপাং—'

চকিত সলজ্জ ভঙ্গিতে ঝুমুর, 'ধ্যাৎ অসভ্য।'

কেতকী ঝুমুরের চিবুক নেড়ে দিয়ে, 'ওরে আমার সতী রে…'

এবার ঝুমুরের কণ্ঠেও স্বতস্ফূর্ত হাসি, যে হাসির মধ্য দিয়ে কিছু বেদনার্ত স্মৃতির অতর্কিত আঁচড় ভোলা যায়, এবং নিজের অস্তিত্ব

হয়ে ওঠে অর্থবহ, নিজেকে মনে হয় বাধাহীন মুক্ত, মুহূর্তের জন্য হলেও।

ওরা নিশ্চুপ উভয়েই। সন্ধ্যার তরলিত অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হওয়া এবং নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দের মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রান্ত। আস্তে আস্তে কেতকীর মুখের চেহারা বদলায়, গলার স্বর বদলায়, যে স্বর ক্ষোভ বেদনা বিদ্রূপে শানিত, বলে, 'দেখ, ঝুমুর, এসব ভেবে কোনো লাভ নেই রে। এই তো আমারও, বয়স হয়ে গেল, কিন্তু কি করব! আমি চেষ্টা করেছি চাকরির, আমি তো···। অথচ বাড়িতে সকলের চোখে, বুঝি সব, আমি অপরাধী, আমি তাদের ঘাড়ে বোঝা। তা দাও না বাবা তোমরা একটা জোগাড় করে। তোমরা যা করবে তাই, আমার মতামত ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিচ্ছু নেই—'

হঠাৎ যেন নিজের লক্ষ্যহীন অসংযত ক্ষোভের লাগাম টেনে ধরে। একটু থেমে বলে, অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে, 'বুঝি রে ঝুমুর। জীবনের অর্ধেকটা প্রায় কেটেই গেল, বল! এক-এক সময় কি রকম যে—মনে হয় কিছুই হল না, কিছুই পেলাম না। কেমন যেন শেষ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেলাম। কেমন যেন সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল, কেমন যেন···। যাকগে! ওসব যত ভাববি ততই হতাশা। ভাববি, জীবনে সকলে সবকিছু তো পায় না, আমিও পেলাম না, ব্যস! ও-টুকুই সান্ত্বনা। হেসে ফূর্তি করে কাটিয়ে দাও যতক্ষণ আছ!'

কেতকীর এ-কথা, কথা বলে যাওয়া, যা অনেক প্রলম্বিত হতে পারে, তবু শেষ হয়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ওদের দৃষ্টি দূরে দূরে কিছু আলোকবৃত্তের দিকে স্থির।

'কেতকী?'

'কি?'

'আচ্ছা, তোর সঙ্গে একটা ছেলের...'

'কি?'

'মানে, ছিল '

'ছিল।'

'কি হল—হল '

'না।'

'কেন?'

'হল না। আমার চেয়ে ভাল মেয়ে, আরো অনেক কিছু পেল, তাই—'

ওরা আবার নিশ্চুপ। ওদের কথা বলা শেষ, যেহেতু কথার আর খেই নেই। এই যে এতক্ষণ কথা বলে যাওয়া, একটা প্রসঙ্গ ধরে, এবং কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গের শীর্ষে পেঁছে যাওয়া, যেখানে শেষ করতেই হয়। নাটকের অন্তিম পর্বে অনিবার্যভাবে পর্দা নামার মতো।

এক সময় ওরা ওঠে, উঠতে হবে বলে। গঙ্গার ঘাট পেছনে রেখে ওরা ডাইনে বাঁক নেয়। এবং ইডেন, বেতার ভবনের পাশ দিয়ে হেঁটে ধর্মতলায় পৌছয়। তারপর ওরা দুজন চলে যায় দুদিকে। অথচ ওদের মনে হয়, ওদের যেন ফিরে যাবার ঠিকানা নেই, সুনির্দিষ্ট কোনো ঠিকানা।

ফেব্রুয়ারি ১৯৮১

হাঁসের ডিম

১.

লোকটা কিম্ভূতদর্শী।

নাকটা বেঢপ। দু-চোখের বোল থেকে নেমে এসে ঠোঁটের ওপর বড় বেশি উঁচু আর ছড়ান। ছিদ্র দুটো প্রশস্ত ও গভীর—মেটে ইঁদুরের গর্তের মতো, এবং ছিদ্রের মুখে লোমশ গুল্ম। ভ্রূ জোড় থ্যাবড়া, হ্রস্ব ও মোটা দাগের। কান—শাল পাতার ঠোঙা এবং কানের পাতা ঘিরে ঘন লোম। বাঁ-চোখের নিচে একটা বড় আকারের আব, গোলাকার ঝুলন্ত মাংসপিণ্ড, যার ভারে চোখের ঠুলি নিচ অভিমুখে টান টান, ফলত দু-চোখের গঠন আলাদা—দৃষ্টি এবং ব্যঞ্জনাও। দাঁতগুলো বিশ্রী রকম উঁচু ও সামনের দিকে বাঁকানো, যে কারণে ঠোঁটের আবরণহীনতায় বেআব্রু ও সর্বক্ষণ জাগা।

নাম, সনাতন মুদি—লোকটার। সামনে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে একটা জলচৌকির ওপর ওর সারাদিন উপবেশন। কালো তিজেলের কলসে তেল গুড়, খোরা-মালসায় সামান্য ডাল নুন মশলাপাতি, কাগজ সাঁটা ভাঙা বোয়েমে নেড়ো মুড়কি চিড়া চেনাচুর বাতাসা, কাঠের তাকে সস্তা সাবান, কাগজের মোড়কে দাঁতের পাউডার, ধূপকাঠি। সনাতন মুদির এই পুঁজিপাটা—জীবিকার্জনের রসদও। দোকান সাদামাটা। মাটির ঘর, খড়ো চাল, স্বল্প পরিসর।

কুলুঙ্গিতে প্রদীপের কালো ধোঁয়ায় বিবর্ণ সিদ্ধিদাতা, আড়ার সঙ্গে বাঁধা সরু একতারে ঝুলন্ত লণ্ঠন। দোকানের দরজাটা ছোট এবং এতই, ঘাড় গুঁজে না ঢুকলে মাথায় ঠোকা লাগে। দরজা পেরিয়ে ঢুকে ডান দিকে সজ্জাহীন পসরার মাঝখানে সনাতন মুদি, এবং ওর বাঁ-দিকে একটা বাঁশের মাচা, একটা মানুষের শোয়ার মতো, যেখানে সনাতন মুদি রাত্রে শোয়। মাচায় এখন আহ্নু পিসি বসে।

আহ্নু পিসির গায়ের চামড়া শুঁটকি মাছের গা—খসখসে অাঁশাল। স্তন শুকিয়ে আমসি। চোখের কোল, গাল, চিবুক, গলার মাংস শুষ্ক, শিথিল, থকথকে। মাথার চুল সাদা, ছোট ছোট, কদম ফুলের মতো। আহ্নু পিসির কথাগুলো, যেহেতু ফোকলা মাড়ি, তাই, দু-ঠোঁটের ফাঁকফোকর গলে বেরিয়ে আসে, যে কারণে উচ্চারণ স্যাঁতানো, জ্যাব-জেবে—যেন কথা বলছে গালে মিছরি চুষতে চুষতে। 'আমি কেমন করি বুঝব, আমার তো ব্যামো, কটিন ব্যামো, শয্যেশায়ী—তা আমার সন্দ হয়ছ্যালো, ছেলে-বৌ এত যত্নআত্তি করে কেন। বৌকে তো আর চিনতে বাকি লেই, কি ঘরের মেয়ে বাবা, হাত দিয়ে জল গলে না। সে এত স্যাবাযত্ন করে। তখন তো বুঝি নি পেটে পেটে এত শয়তানি—এমন সব্বনাশটা করবে আমার—'

খবরটা গুহ্য এবং ঘরোয়া, যা আরো পাঁচজনের কাছে গল্প করা যাবে, বেশ জমিয়ে—শোনার পর সনাতন মুদি পাটার ওপর নড়েচড়ে বসে, এবং বলে, 'তা'লেই বোঝ পিসি, মায়ের সাতে এমন বেইমানি, নিজের পেটের ছেলে হয়ে।'

আহ্নু পিসির মুখের ভাব বদলায়। গলার স্বর হয়ে ওঠে খর প্রতিবাদী। 'না না বাপ, ও আমার ছেলে লয়। আমার শত্তুর—এই পোড়া পেটের। ওর তরে ডাক্তার-বদ্যি মায়ের থান কবজ-তাবিজ কিনা করেচি। ধম্ম আচে, মিত্যে বলব নি বাবা, তিন

বছর আঁশ ছুঁই নি। রাতকে-রাত জেগে কাটিয়েচি। আর আজ, এই কি তোর ধম্ম, তোর কত্তব্য—মা বুড়ো হয়েচে, গতর গেচে, তাকে তুই যদি দুটো খেতেপত্তে না দিস, তা'লে তুই কিসের ছেলে! ও আমার ছেলে লয় বাপ। এমন জানলে ও-ছেলের গলায় নুন দে' আঁতুড় ঘরেই শেষ করি রাকতুম।'

'কিন্তু পিসি ভুদো এমন তো ছ্যালো নি।'

'ছ্যালো নি তো বাপ। আকুসী বৌটাই ওর মাতা খেয়েচে চিবো চিবো। সব সময় নাগান-ভাঙান কুমন্তরনা—ছেলের কি মাতার ঠিক থাকে। এখন তো একাবারে মেগের ভেড়ো। মাগ যদি বলে ওঠ তো ওঠ, বোস তো বোস।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ আদু পিসি মনস্কতা বদলায়, কথা বলার প্রসঙ্গও, নিজস্ব পোশাকি দক্ষতায়। 'দে বাবা, চাড্টি মুড়ি দে! খিদে পেয়েচে বড়—'

সনাতন মুদি যেন গলা সমান জলে পড়ে গেছে, এমনই বিপর্যস্ত মুখের চেহারা। 'পয়সা—'

'দুবো রে বাপ, দুবো।'

'না পিসি, ধারটার দিতে পারব নি।'

'ধার লয় বাপ, আমি লিজেই দে যাব, কাল,—দে গণ্ডাচার পয়সার মুড়ি।'

সনাতন মুদির এখন ফাঁসকলে আটকা পড়া অবস্থা। অন্য সময় হলে নির্দ্বিধায় খেদিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এখন, এমন একটা অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে আদু পিসির কাছে বধ হতেই হয়। অগত্যা বাঁ হাতে একটা টিনের মুখ খুলে আধ কুনকে মুড়ি তুলে বলে, 'আঁচল পাতো—'

আঁচল পাততে গিয়ে আদু পিসিকে বুকের কাপড়টুকু নামাতে হয়, যেহেতু আটহাতি কাপড়ে শরীর ঢাকতেই অকুলান।

সনাতন মুদি আঁচলে কুনকেটা উপুড় করে দেয়। সামান্য মুড়ি, আঁচলের ছোট পুঁটলিতে, যার গলাটা মুঠোয় চেপে ধরে আহ্লু পিসি দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

দোকানের নিচে খানিকটা চত্বর। চত্বরের উত্তরে পলাশবাসিনীর মন্দির, মন্দিরের দেয়াল—থাক থাক নোনা ধরা জীর্ণ ইটের, যার ফাঁকফোকরে শিকড় চারানো গাছগাছড়া। দক্ষিণে গ্রামের অন্তঃস্থল থেকে রাস্তাটা বেরিয়ে এসে মন্দিরের গা দিয়ে বাঁয়ে ঘুরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেছে বাঁধের ওপর। আহ্লু পিসি উত্তরমুখো রাস্তা ধরে বাঁধের ওপর ওঠে। বাঁধটা চওড়া, মানুষ চলার রাস্তার মতো।

গরু তাড়িয়ে কে যেন আসে, বাঁধের দক্ষিণ দিক থেকে; কাছাকাছি আসতেও আহ্লু পিসি ঠিক ঠাওর করতে পারে না। একেই চোখে ভাল দেখতে পায় না, তারপর মরা বিকাল চোখের সামনে অন্ধকার কালো পর্দার ভাঁজ খুলছে পরতে পরতে।

'কে যায়?'

'সুবল গো—'

'কুন গাঁ?'

'চৌহাট্টা।'

'সন্তা বাগের ব্যাটা?'

'হ্যাঁ।'

'খেতি করি ফিরতেচিস?'

'হ্যাঁ।'

'এট্টুন ডাঁরা—'

'না গো, সুময় লাই।'

'এট্টু বাপ, এট্টা কতা শুনে যা—'

কাঁধে হাল মানুষটা সামনে দুটো বলদ তাড়িয়ে নিয়ে আহ্লু পিসির পাশ দিয়ে চলে যায়।

উঁচু বাঁধ, বাঁধের দুদিকে দীর্ঘ নাবাল জমি, বাঁধের ওপর একজন বৃদ্ধা, ন্যুব্জ বেঁটেখাটো শরীর—বিকালের তরলিত আলো-আঁধারে আকাশের বিস্তীর্ণ ক্যানভাসে পরিপূর্ণ শিল্প হয়ে ওঠে যেন-বা!

আদু পিসি বাঁধের রাস্তা ধরে হাঁটে আর শীর্ণ মুঠোয় কোঁচড় থেকে মুড়ি নিয়ে গালে দেয়। মুখের লালার রসে মুড়িগুলো ভিজে নরম টসটসে তুলতুলে হয়ে ওঠে। তারপর সেগুলো টাগরার তলা দিয়ে চালান করে দেয় পেটের ভেতর। পেটে খিদেও খুব। সেই কুন দুপুরে দু-মুঠো ভাত! কত চেয়ে আর একটা দানাও দিলে নি, কুচুটে কুঁদুলে মেয়েছেলেটা। তোদের তরে হাঁড়ি হাঁড়ি। আর আমায় দুটো দিতি বুক ফাটি যায়। খা খা, শেষ খাওয়া খেয়ে নে। চৌদোলে চেপে একেবারে ঘাটে যাবি। ওলো, তবু যদি আমি তোদের ন্যায়টদার হতুম, তা'লে কি নাতিটাই না-জানি মাত্তিস। ছ্যাদা মালায় করেও মুকে মুত্তিস নি। আমি কারো খাই না পরি। আমি তো কারো ন্যায়টদার নই মা। আমি আমার ভাতারের খাই। আমার ভাতার যা রেকে গেচে, আমি ঠ্যাঙে ঠ্যাঙ তুলে মোচটি মুলে খাবো। ওলো আমায় না দিয়ে ননি, কত ধন বাঁধবে তুমি। যেমন দেখাবে, তেমনি দেখবে, এটাই বিধির নিয়ম। ঐ তোদের গভ্‌ভেরটাও বড় হয়ে মুকে নাত্তি মারবে, খেতে দেবে নি, পত্তে দেবে নি—দিনে রেতে ঠুসবে···

বাঁধের ওপর দিয়ে কে যেন আসছে, জুতো পায়ে, বাঁধের শুখনো মাটিতে জুতোর খট্‌ খট্‌ শব্দ।

'কে যায়?'

'আমি, অনন্ত—'

'বাড়ি ফিচ্ছস!'

'হ্যাঁ গো—'

'এট্টু ডাঁড়িয়ে যা বাপ। ত্বটো কতা বলব, এট্টু ডাঁড়িয়ে যা।'

অনন্ত কোনো উত্তর দেয় না। কাঁধে ব্যাগ, হাতে ব্যাগ, মালপত্রে ঠাসা—হনহন করে চলে যায় আহ্ন পিসিকে পাশ কাটিয়ে। আসানসোলে কাজ করে অনন্ত। সেখানেই থাকে। সপ্তাহান্তে শনিবার বাড়ি ফেরে। তখন তার মন বৌ-ছেলে-মেয়ের চুম্বকি টানে বাতাসে উড়ে যেতে চায় যেন।

আহ্ন পিসির কোঁচড়ের মুড়িগুলো নিঃশেষ। পেটের খিদে তবু অনেকটা মরেছে। অনেক কিছুই খেতে ইচ্ছা করে তো—মণ্ডামিঠাই, মাছভাজা, গরম নুচি, নারকেল কুরো দিয়ে মুড়ি আরো কত কি! তা আগে খেয়েছে, স্বামী বেঁচে থাকতে—রাবড়ি, দই, পানতুয়া—যখনই শহর-গঞ্জে যেত নিয়ে আসত। এখন আর কে খাওয়াবে, বেটা বেটা-বৌ? ত্বটো ভাত দিতেই মরে যায়।

অন্ধকার, মাঠ আকাশ মাটির বুকে নেমে আসছে, শকুনের ডানার মতো, ক্রমশ। আহ্ন পিসির দৃষ্টিতে সে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। বাড়ি ফিরতে এখনো অনেকটা পথ। আগে চৌহাট্টা, তারপর ঝিকর্দা। পৌঁছতে সন্ধে। চেনা গাঁ-মাটি পথ-ঘাট। আঁধার হাতড়ে হাতড়ে চলে যাবে ঠিক। নেহাৎ অসুবিধা হলে গাঁয়ের কোনো মানুষের সঙ্গ নেবে। 'আমার হাতটা এট্টু ধরত বাপ। ঠিক ঠাওর কত্তে পাচ্চি নি।'

অবশ্য চৌহাট্টার ভেতর দিয়ে গেলে পথ অনেকটা ছোট হয়ে যায়। পৌঁছেও যায় সন্ধের আগে। কিন্তু পাড়ার ছোঁড়াগুলো বড় পেছু লাগে, ঢেলা ছোঁড়ে—'আহ্ন বুড়ি থুথড়ি, যাবি কবে যমের বাড়ি—।' আহ্ন পিসি রেগে যায়, গালমন্দ করে, 'ওরে ও নিঃবংশের ব্যাটারা, আঁটকুড়ির ব্যাটারা, তোদের বাপ যাবে রে, তোদের চোদ্দ গুষ্টি যাবে। আমার পেছনে নাগা লয়। সব মরবি পট পট করে।

তেরাত্তির পোয়াবে না রে। মায়ের কোল শূন্যি করি চলি যাবি। ধাওয়া যমে ধেইয়ে নে যাবে। ওলাউটো হবে, তোদের ও-মুকে কুট হবে। খসে খসে গলে গলে পড়বে। অক্ত বমি করি মরবি সব…'

কে যেন আসে, পায়ের শব্দ, শুকনো মাটির বুকে মৃদু ধপ্ ধপ্—আদু পিসির কানে পৌঁছায়। ক্রমোত্থিত শব্দে মানুষটার সঙ্গে দূরত্বের নিরিখ নেয় আদু পিসি।

'কে যায়?'

কোনো উত্তর নেই।

একটা মানুষ, ছায়াছায়া, অাঁধারে নড়ে—শরীর, দু-হাত দু-পা।

'এট্টু ডাঁড়িয়ে যা বাপ। আমি আদু পিসি। দুটো কতা শুনে যা।'

মানুষটা দাঁড়ায়, একটু তফাৎ রেখে। ম্লান দৃষ্টি আর অাঁধারি অস্পষ্টতায় ছায়াছায়া শরীরটা বুকে সম্ভব-অসম্ভব আশঙ্কা জাগায়। 'কে বাপ তুই?'

মানুষটা নিরুত্তর।

'তা তুই যেই হ'স, মানুষ তো বটে। আমি আদু পিসি। ঝিকদ্দার ভূদো গড়াই, তার মা। তা বাপ, ব্যাটা আমায় ভাত দেয় নে, পত্তে এট্টা কানিও দেয় নে। ঘরকে সারা দিন ন্যাংটো হয়ে বসে থাকি, উদোম ন্যাংটো। বৌটাও দজ্জাল কুচুটে। মাগি সব্বক্ষণ আকচা করার তরে মুকিয়ে থাকে। তা বাপ, আমার তো ব্যামো হয়েছ্যালো। বাঁচবো আশা ছ্যালো নি। জ্ঞানগম্যি ছ্যালো নি তিনদিন। তা বৌ-ব্যাটা যে আমায় কি তুক করলে। বললে, মা তুমি এই কাগজটায় সই কর। আমারও কি বেভ্ভেরম,—কিসে করব, কেন করব বুঝলুম নি, সই করি দিলুম। বৌ-ব্যাটা হুড়ো করি সব সম্পত্তি নিকিয়ে নিলে বাপ…'

মানুষটা, নির্বাক নিথর পাথরের মতো মূর্তিটা, এবার নড়ে। গলায় বাঁশ চেরাই শব্দ—রুক্ষ, কর্কশ, 'ব্যাটা তোর সব হুড়ো করি নিল, না—'

সে কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে আতু পিসি, যখন নিজেকে গোপন করার আর পথ থাকে না, নিজের শরীরের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে ফেলার নিরুপায় চেষ্টা ছাড়া, ভয়ে শরীরটাকে সিঁটিয়ে গুটিসুটি পাকিয়ে—অকস্মাৎ ফাঁদে পড়ে যাওয়া শৃগালীর মতো।

অস্ফুট কয়েকটা শব্দ, যেন নিজের অজ্ঞাতে, গলা উগরে বেরিয়ে আসে, 'ভূদো, ভূদর—'

'না তোর যম' বাতাস কাঁপানো গর্জনে আঁধারি শূন্যতা চিরে চিরে যায়। মানুষটার শক্ত মুঠো শীর্ণ কব্জি কামড়ে ধরে। 'চ আজ ঘর চ। ব্যাটার বদনাম গেয়ে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়। তোকে খেতে দিই নি, পত্তে দিই নি। তাই করব তোকে। খুঁটোয় বেঁদে রাকব।'

বলিষ্ঠ একটা হাত জীর্ণ দুর্বল একটা দেহকে টানতে টানতে নিয়ে যায় বাঁধের ওপর দিয়ে। আর মানুষটার ত্বরিৎ গতির সঙ্গে সামাল দিতে না পারায় আতু পিসির ধ্বস্ত টালমাটাল দেহ—পায়ে পা জড়িয়ে হোঁচট খায় অনবরত।

২

ঝাঁ ঝাঁ রোদ মাথায় নিয়ে মিস্তি মাঠ পার হয়।

মিস্তির শরীরে একটা আটহাতি আচ্ছাদন, গত সনে বন্যার রিলিফে পাওয়া। কাপড়টায় কোমর কয়েক ফেত্তা বেড় দিয়ে আঁচলের অংশটুকু আড়াআড়ি বুকে ফেলা। ফলত, আমূল দুই বাহু, কণ্ঠা ও পিঠের একাংশ, হাঁটু পর্যন্ত পা সম্পূর্ণ খোলা। মিস্তির শরীরের এই খোলা অংশগুলো, এমন কি চেহারাটাই এমন, যাতে সাদামাটা

অথচ অন্তর্লীন শোভা আছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক বুকে ঝিলিক মারার মতো কোনো গোপন সৌন্দর্য নেই।

মিস্তির ডান কাঁধে একটা খাবলা জাল। ডান হাত কনুই বরাবর ভাঁজ করে কাঁধের কাছে হাতের মুঠোয় জালের বেড়টা ধরা। ফলে জালটা সম্পূর্ণ পিঠে ঝোলান। সামনের দিকে কোমরের কষিতে বেতের খালুই।

গ্রীষ্মের দাহে মাটি ফাটে, জল শুখোয়, গাছগাছালি পুড়ে আংরা। অভাবি ঘরের বৌ-ঝি-রা খাল-বিল চুঁড়ে, পাঁক ঘেঁটে মাছ ধরে। জাল নিয়ে সকালে বেরিয়েছিল মিস্তিও। খাল ডোবা ছিঁচে, জাল মেরে যা পেয়েছে—কিছু পুঁটি-মৌরলা আর গণ্ডা দুই কৈ-ল্যাঠা, সবই খালুইয়ে।

সূর্যটা খাড়াখাড়ি, মাথার ওপর, গনগনে আগুন জ্বলা, যা শরীরে জ্বালা ধারায়, পেটেও। সারা গায়ে পাঁকের গন্ধ, আঁশের—পাঁক-জল শুখিয়ে গায়ে খড়ি ফোটে। দুটো ভাতের জন্য বুক এখন হানটান, যে কারণে পা দুটো ছুটে যায় ঘরের দিকে। তা ভাতার-সোহাগী ছুঁড়ি কি রেকেচে চাট্টি ভাত তার তরে। দু-দিন এসেই হাঁড়িকড়ি আগলাতে নেগেচে।

মাঠে এই আল ধরে যেতে যেতে দূরে গাছ পাতার আড়ালে ভূধর গড়াইয়ের বাড়ির উঁচু চালা দেখা যায়। দুতলা ঘর, ওপরের চাল টিনে ছাওয়া, দূর থেকে দৃশ্যত যা একটা বড়সড় মহিষের পিঠ।

মিস্তি মাঠ ছেড়ে গ্রামে ওঠে। গ্রামের সরু রাস্তা—দুধারে কোঙা, ভ্যারাণ্ডা, আকন্দের ঘন সন্নিবেশ। সমগ্র গ্রাম পাথরের মতো কঠিন ভারি ব্যাপ্ত নির্জনতায় মগ্ন। মাঝে মাঝে আলুলায়িত কিছু ধ্বনি, অস্পষ্ট দূরাগত তানের মতো—ওলাবিবির থানে পড়ুয়া ছাত্রদের সুর করে পড়ার স্বর—বিলোল বাতাসে ভর করে ভেসে আসে, যা নৈশব্দতাকে আরো নেশাচ্ছন্ন করে।

ভূধর গড়াইয়ের খিড়কি পথ ধরে যেতে যেতে মিস্তি এক ঠারে ভেতরটা দেখে নয়। প্রশস্ত উঠানের মাঝখানে মরাই, দক্ষিণে বাথান, সারি সারি গাই, সুপুষ্ট—মেঝেয় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে কচর কচর চোয়াল চিবোচ্ছে। এবং ভূধর গড়াইয়ের বৌ, যে বাথানের গাভী-গুলোর মতোই বছর বছর গাভিন হয়, এবং প্যাঁকাটিপারা যার চেহারা, এখন এই ক্লান্তিকর দুপুরেও বাথানে নাদ পরিষ্কার করে। কিন্তু মিস্তি, যা দেখতে না-চেয়েও দেখবে ভাবে, তা দেখতে পায় না।

খিড়কি আর পুকুরের মাঝখানে সরু পথটুকু পার হয়ে মিস্তি ডাইনে বাঁক নিয়ে পুকুরপাড় ধরে হেঁটে যায়। ভূধর গড়াইয়ের পুকুর, বিশাল একটা ঝিলের মতোই, যার পাথরের মতো কালো জলে ভেসে বেড়ানো অসংখ্য হাঁস। পুকুরটা পার হলেই ঘর—হেলে পড়া মাটির দেয়াল, খোলার চাল, আংশিক উঠোন—ভাই-ভাজের সংসার, যেখানে মিস্তির প্রতি মুহূর্ত অনধিকার অবস্থান।

উঠানে পা দিয়ে মিস্তি ভাজের ঘরের দিকে তাকায়, দরজা বন্ধ। কাঁধ থেকে জালটা নামিয়ে রান্না ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়। কোমরের কষিতে বাঁধা খালুইটা খুলে দাওয়ায় রাখে। পা টিপে রান্না ঘরে ঢুকে একটা হাঁড়ি বের করে। পুকুরে নেমে হাঁড়িতে জল ভরে, এবং আবার দাওয়ায় উঠে এসে পা মুড়ে বসে। তারপর খালুইটা উপুড় করে দেয় মেঝের ওপর।

ভাইবৌ নিঃশব্দে দরজা খুলে বকের মতো ঠ্যাং তুলে তুলে মিস্তির পেছনে এসে দাঁড়ায়। মিস্তির শরীরের ওপর দিয়ে শরীরটা সামনে বেঁকিয়ে জুল জুল দৃষ্টিতে দেখে। 'কি মাচ ধল্লে গো

মেঝের ওপর উপুড় করা মাছগুলোর কিছু মরা, কিছু জ্যান্ত। কৈ আর সোল-ল্যাঠাগুলো এখনো লাফাচ্ছে ধড়ফড় করে। জ্যান্ত মাছ-গুলো জিয়োল হাঁড়িতে তুলতে তুলতে মিস্তি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়।

ছুঁড়ির মুক দে যেন মদু পড়চে। ধরেচি লো রুই মিরগেল কাতলা —তোর তরে, খাবি। যা গতর করেচিস ভাতারের সোহাগ খেয়ে খেয়ে, আবার রুই মিরগেল, দেকতে হবে নি তাহলে···

জ্যান্ত মাছগুলো হাঁড়িতে তোলা হলে মরা মাছগুলো তুলে একটা সরায় রাখে। সরাটা হাঁড়ির মুখে চাপিয়ে হাঁড়ি সমেত রান্নাঘরে রেখে আসে। তারপর ভাজের উপস্থিতিকে আদৌ গ্রাহ্যে না এনে এক লাফে উঠোন, এবং উঠোন থেকে তরতর করে নেমে যায় পুকুরের দিকে, স্নান করতে।

যেতে যেতে ভাজের ঘরের দরজাটা সজোরে বন্ধ করার শব্দ শুনতে পায় মিস্তি। ভাই বাঁকু কি ঘরেই আছে, মাঠে যায় নি!

ভূধর গড়াইয়ের সান বাঁধানো ঘাটের দিকে মিস্তি যায় না। ওঘাটে স্নান করতে দেখলে ভূদোর দজ্জাল বৌ খেঙরা নিয়ে তেড়ে আসবে। আর স্নান করতে যাওয়ায় ইদানীং মিস্তির যে এক রকম নিষিদ্ধ স্বাদ, রোমাঞ্চ—গোপন অভিসারের মতো, যার টান শত চেষ্টা সত্ত্বেও কাটিয়ে উঠতে পারে না, ওঘাটে গেলে তা একাবারেই মারা যাবে। পা-দুটো যন্ত্রের মতো উত্তরের ঘাটে টেনে নিয়ে যায় মিস্তিকে।

কাঁচা ঘাট। কাটা তাল গাছের কয়েকটা ধাপ। হেলে পড়া বাঁশ আর তেঁতুলের ঘন শাখা-প্রশাখার অবগুণ্ঠনে জায়গাটার গোপনীয়তা সংরক্ষিত। মিস্তি শেষ ধাপে নেমে শরীর জলে ছেড়ে দিতেই জল বুক ছোঁয়। পাখনার মতো দু-হাতে জল সরিয়ে ডুব দেয়, এবং ওঠে। ডুব দেয়, ওঠে, ডুব দেয় ··। এক সময় থামে মিস্তি, যখন দিতে দিতে প্রায় হাঁপিয়ে ওঠে। জল ছোঁয়া বুক দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে ওঠে নামে। সারা দিনে দেহের অবসাদ জলে ধুয়ে যায়, আর কায়েম করে একটু একটু করে ভিন্নতর ক্লান্তি, ক্ষুধার। পায়ে, পায়ের গোছে, জলের ভেতর শরীরের আঢাকা অংশগুলোতে

ঝাঁক ঝাঁক চারা পোনা কুরকুরে দাঁত দিয়ে কামড়ায়, সুড়সুড়ি দেয়। জলে দাঁড়িয়ে মিস্তি হাত-পা নাড়ে। মাছগুলো দূরে সরে যায়। কিন্তু মুহূর্ত পর আবার। মরব একদিন এই জলে ডুবে, গলায় কলসি বেঁধে। দেওটা পচে ফুলে ভাসি উঠবে। তকুন খাস, আশ পুইরে।

মিস্তি ঘাড় ঘুরিয়ে চকিত ঘাটের দিকে দেখে নেয়। মুখ ফিরিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে দু-হাতের অঞ্জলিতে জল ভরে মুখে ঢালে, এবং সে জল আবার ধীরে ধীরে উগরে দেয়। জলের ধারা ঠোঁটের কোল বেয়ে চিবুক, গলা, বুক ছুঁয়ে আবার পুকুরের জলে মিশে যায়।

শুখনো বাঁশ পাতার খসখসানিতে পায়ের শব্দ। শব্দটা থামে। ঘাটে এসে দাঁড়ায় ভূধর গড়াই। দীঘল কালো, মজবুতি চেহারা। আদুল গা, লোমশ বুক।

'মিস্তি চান কচ্চিস?'

মিস্তির হাসি পায়। মরণদশা মিনসের! না লো ডুবে মত্তেচি তোর বিহনে।

'মিস্তি তুই কোত্তা থাকিস, সারাদিন। দেকি না—'

মিস্তির আরো জোরে হাসি পায়। ভূধর গড়াই-এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে স্ফুরিত দুই ঠোঁটে হাসি সংযত করে। কোমরে কাপড়ের কষিতে শক্ত গিঁট দেয়। বাকি কাপড়ে ভালো করে বুক ঢাকে, দেহ। ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্তি, জলের ভেতর সতর্কে পা চালিয়ে ঘাটের কাছে আসে। তাল কাঠের প্রথম ধাপে এক পায়ে ভর আরোপ করে উঠতে যায়, তৎক্ষণাৎ ভূধর গড়াই হাত বাড়িয়ে মিস্তির একটা হাত ধরে এবং সামান্য টনতেই মিস্তি ওপরে উঠে আসে।

মিস্তি এবং ভূধর গড়াই দাঁড়িয়ে হাতখানেক দূরত্বের ব্যবধানে। মিস্তির হাত তখনও ভূধর গড়াইয়ের মুঠোয় ধরা। আবেগতাড়িত স্বরে

ভূধর গড়াই বলে 'মিন্তি, তুই আসবিনি—আয় না আজ রেতে, আমি ডাঁড়িয়ে থাকব।'

মিস্তি হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টান দিতেই ভূধর গড়াইয়ের মুঠো থেকে হাতটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। এবং তৎক্ষণাৎ, ভূধর গড়াইয়ের অনুমানের আগেই, দু-হাত দিয়ে ওর লোমশ বুকে সজোরে ঠেলা মারে। অপ্রস্তুত ভূধর গড়াই টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যায়।

মিন্তি খিলখিলিয়ে সজোরে হাসতে হাসতে এক লাফে ওপরে উঠে আসে। ভূধর গড়াই কোমর জলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে, 'মিন্তি আসিস কিন্তু রাত্তিরে, ওলাবিবির থানে যখুন পুজোর ঘণ্টা বাজবে, তখুন। আমি ডাঁড়িয়ে থাকব—'

মিন্তি ছুটে অদৃশ্য হয়, শুখনো পাতায় খসখসানি আর খিল খিল হাসি তুলে। এবং সে হাসির রহস্যময় রেশ দুপুরের এই পুকুর পাড়, গাছগাছালি, নির্জন-নিস্তরঙ্গ পরিমণ্ডলে বহুক্ষণ একাকার হয়ে থাকে যেন-বা।

৩

দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে মিন্তি শুয়ে। আকাশের পশ্চিম কোলে সূর্য হেলে পড়েছে। গাছগাছালির ছায়া পুবে দীর্ঘতর হয়। তবু বাতাসে এখনো হিলহিলে তাপ। মনে অসংলগ্ন চিন্তা, আকাশের বুকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতো। মিন্তির সারা অঙ্গে দাহ, বুকে বেদনার দংশন। দৃষ্টির পরিমণ্ডলে ভূধর গড়াইয়ের খিড়কি দুয়ার, ব্যাপ্ত আকাশ, আকাশের শূন্যতায় ভাসমান মেঘ, পাখি, এবং একটা মানুষ—দু-হাত দু-পা ছড়ানো পাখনা, বাতাস কেটে কেটে মাছের মতো স্বচ্ছন্দে।

গঞ্জের আড়তদার বাবুরা আসে। 'মুকা, তুই এবার পিট ফোঁড়া হবি নি ?'

'না গো বাবুরা। বড় কষ্ট পিট ফোঁড়ায়।'

'বলিস কি রে! পিট ফোঁড়া ছাড়া জমবে কেন। এত বছরের চড়ক—'

'সে বাপু আপনেরা অন্য নোক দ্যাখো।'

'পাবো কোথা! তাছাড়া তোর পালা। শোন সুকা, তোকে না হয় বেশিই দোব। একশ ট্যাকা দিই, একশ চল্লিশ ট্যাকায় রফা—'

বাবুরা চলে যায়, মানুষটার সামনে লোভের চার ছড়িয়ে।

মানুষটা বলে, 'মিস্তি কি করি বলত?'

'না, নহ্—' মিস্তি প্রতিবাদী, বাধার প্রাকার।

'কিন্তক ট্যাকা, এতগুলান…'

'না গো না। ট্যাকা বড় না জ্যেবন! ট্যাকায় দরকার লেই আমার। না খেতি পাই তাও!'

শঙ্কিত বুকে মানুষটাকে আগলে রাখতে চায় মিস্তি।

গঞ্জের বাবুরা আবার আসে। 'সুকা, কিছু ভাবলি?'

সুকা নিশ্চুপ, লোভ আর মিস্তির ভালোবাসার দোটানে। মিস্তির ভালবাসা যে মনকে দুর্বল করে দেয় বড়।

'শোন সুকা, আরো কিছু বাড়িয়ে দোবো। পুরোপুরি দুশো। শেষ কতা, ভেবে দেখ।'

চৈত্রের পোড়া আকাশ মাটি, রক্তে হিল্লোল তোলা ঢাক ডগরের শব্দ, উপবাসী পেট মানুষটাকে আর ঘরে থাকতে দেয় না।

দুটো মানুষ, একটা উঁচু আলম্বের দুই দিকে—বাগিনার টুসু ভল্লা আর ঝিকর্দার সুকা বাগদি, যাদের কেমরের শক্ত মাংস গজালবিদ্ধ। এবং তারা ঝোলে—উপুড় করা দেহ, দূরান্ত মাটির পানে মুখ, নিরবলম্ব শূন্যতাকে আশ্রয় করে—যেন আকাশের বুকে পাখসাট খাওয়া চিল।

মানুষটা ঘরে ফেরে, শিকারীর শরবিদ্ধ যন্ত্রণা অঙ্গে নিয়ে। কোমরের দগদগে ক্ষত পচনোন্মুখ। এক সময় হঠাৎ বেদনাহত দেহ খেঁচে যায়, টান টান ছিলায় ধনুকের মতো, নাক মুখ ঘাড় বেঁকে বীভৎস, গলায় স্ফূরিত গোঁঙানি। এবং যন্ত্রণায় দেহটা পিষ্ট হতে হতে ঝিমিয়ে অসাড় হয়ে যায় ক্রমশ।

একটা হ্ঁাকুড়ে ডাকে মিন্তি ধড়মড় করে উঠে বসে। বাপ। দিনের আলো নিষ্প্রভ হলো। বাবা ভাদু বাগদি উঠানে দাঁড়িয়ে, শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় শরীর ঘামে সিক্ত, কাঁধে লাঙল। ভাদু বাগদি এগিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে মাটিতে লাঙলটা রাখে। দাওয়ায় হ্ঁাটু মুড়ে বসে বলে, 'মিন্তি জল দে—'

মিন্তি রান্নাঘরে ঢুকে পিতলের ঘটিতে ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে এনে বাবার সামনে ধরে। ভাদু বাগদি জল খায়। গামছায় শরীরের ঘাম মুছতে মুছতে হ্ঁাক দেয়, 'বাঁকু, বেলা বয়ে গেল, এখুনও নিদ যাস কেনে—'

দোর খুলে বাঁকু বেরিয়ে আসে। পেছনে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভাজ, মুখ ঘোমটায় ঢাকা।

ভাদু বাগদি বলে, 'শোন, ভূদো গড়াই বলদ দিলে নি।'

আদুরি বৌয়ের সোহাগে বাঁকুর ন্যাতানো নেশাচ্ছন্ন শরীর হঠাৎ যেন খোঁচা খাওয়া সাপের চক্কর। 'কেন—'

'বগ্‌গা রেকট কইরেচিস, সেই ডরে। বললে বলদ দুবো নি, বীজ কর্জ কিচ্চু দুবো নি। ত্যাকুনই বলেছ্যালুম তোকে, শুনলি নি। ইদিকে ক্যানিলে জল ছাড়ি দেচে।'

বাঁকুর নিশ্বাসে চাপা গর্জন, 'ভূদো, শালো—'

ভাদু বাগদি ওঠে। বাতা থেকে হাঁসুয়াটা টেনে বের করে। রান্না ঘরের দেয়ালে ঝোলান মাটির কলসিটা হাতে নেয়। তারপর

উঠানের সীমানায় তাল গাছটার নিচে আসে। একটা গোল রশি দু-পায়ের গোড়ালিতে আটকে নেয়। কোমর আলগা করে বাঁধে তাল গাছের সঙ্গে। দু-হাতের চাপে গাছের ওপর উঠতে থাকে। রস গেঁজে কলস উপচে গেছে। নতুন কলস পাততে হবে।

কিছুটা উঠে থেমে যায়। ঘাড় ঘুরিয়ে নিচ দিকে তাকায় ভাদু বাগদি। বাঁকু দাওয়ায় থম মেরে দাঁড়িয়ে। ভাদু বাগদি চিৎকার করে বলে, 'বাঁকু, ও-ভূয়ের রেকট যখুন লিয়েচি, তখুন রুইবোই। আমরা ফুলি ডাঙার ফাকির লই তো বটে। হলেই বা, এই হাত দুটা তো আচে—'

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে মিন্তি দাঁড়িয়ে। মিন্তির স্থির নিরর্থ দৃষ্টির ব্যাপ্তিতে ভূধর গড়াইয়ের রাজ্যপাট—অচঞ্চল গহিনতা বুকে নিয়ে বিস্তীর্ণ পুকুর, খিড়কি দুয়ার, মরাইয়ের শীর্ষাংশ, বাথান, মাটির মাজা ঝকঝকে দেয়ালে দু-মহলা। পুকুরে চরে বেড়ান হাঁস পাড়ে উঠে দিনান্তে ম্লান রশ্মিতে পাখা ঝাড়ে, ছোট ছোট যূথে পার হয়ে যায় খিড়কি দুয়ার। ভূধর গড়াইয়ের হাঁস, শত শত ডিম পাড়বে, শত শত ডিম—ভূধর গড়াইয়ের খোঁয়াড়ে।

গাদা বোট নয়, অথবা বজরাও—একটা বড় আকারের নৌকা, তল ফাঁসা বাতিল, নদীর উপর চরে গেদে পড়ে থাকা। নৌকাটা কত মাস-মরশুম এভাবে পড়ে আছে, অথবা মালিকানা কার, এত খোঁজ খবরে কারো আগ্রহ নেই, যেহেতু দৃষ্টিগ্রাহ্য সাত-পাঁচ অনেক কিছুর মতো এই জানার আগ্রহটুকুও মামুলি। নৌকা ছাড়িয়ে নদীর উপর-চর পার হলেই কিনারা ঘেঁষে লম্বা রাস্তা, রাস্তার বিপরীত প্রান্তে ফুল-লতাগুল্মের বীথি, তারপর মিউনিসিপ্যালিটির শ্মশান, উঁচু পাঁচিল ঘেরা। শ্মশানে ঢুকতে বাঁ-হাতি শিব মন্দির, মৃত্তিকাভেদি প্রস্তর লিঙ্গ। ডানে কালীমূর্তি, ভৈরবদর্শী, লকলকে প্রসারিত জিব, টানা দীর্ঘ জাগর রক্তচক্ষু।

শ্মশানের ভেতরে একটাই চিতা এখন জাগরূক, যার বহ্নিমান অগ্নিগর্ভে একটি দেহ, মানুষের, যদিও বোঝা যায় না, মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণীর—আগুনে পুড়ে, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মাথা স্ব স্ব সংস্থাপন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তালগোল পাকিয়ে এমনই রূপান্তর। চিতা ঘিরে কয়েকজন কিশোর, ঝড়ো কাকের মতো চেহারা, বাঁশের ঠ্যাঙা দিয়ে আগুন ওস্কাচ্ছে।

নদীর উপর-চরে গেদে পড়ে থাকা নৌকাটায় ছৈ নেই, পাটাতন নেই, শুধুই একটা কাঠের খোল। খোলের ভেতর ওরা বসে ট্যারা কালীকে ঘিরে। ওদের একপাশে আড় করা মাটির হাঁড়ির

ভেতর জ্বলন্ত মোমবাতি, যার শিখা নৌকার খোলের উঁচু দেয়ালের ওপর দিয়ে চলকে আসা গাঙ্গেয় বাতাসে বেপথুমান। আর সেই বেপথুমান শীর্ণ আলোর সম্পাতে, নড়াচড়ায়, ভঙ্গ-বিভঙ্গে ওদের মুখাবয়ব, দেহ, ক্রিয়াকলাপের ভাঙচুর প্রফাইল। ট্যারা কালীকে ঘিরে ওর সাকরেদরা—দেড় ব্যাটারি, জোলো, কালো সোনা, থামস্ আপ, ছোট খোকা। এ-সবই ওদের নিক নাম, অর্জিত, যার আড়ালে আসল নাম নিষ্প্রভ—নিকেলে মোড়া ধাতু যেমন। ওদের মাঝখানে তিনটে সাদা বোতল বসানো, যেগুলোর কানায় কানায় দিশি এ্যালকোহল, জয় হিন্দ লেবেল আঁটা। পাশে কয়েকটা ভাঁড়। সকলের চেহারা মোটামুটি এক রকম—রোগা, পাতলা, কিন্তু পলকা নয়, ক্যাকটাসের মতো প্রতিকূলতায় রুক্ষতা শুষ্কতা নিয়ে বেড়ে ওঠা। দেড় ব্যাটারির বাঁ-চোখ নেই, বাঁ গাল থ্যাঁতলানো, ফলত দু-পাটি দাঁত, যার অনেকগুলোই ভাঙা, মাড়িসহ বাইরে বেরিয়ে আসা। বছর দুই আগে দুলুর সঙ্গে এ্যাকসনে দুলুর ছেলেরা ওকে পেড়ে ফেলেছিল। দিনের বেলা খোলা রাস্তায় ফেলে ওর একটা চোখ উপড়ে এনেছিল। ইট দিয়ে মেরে মেরে থোবনা থেঁতো করেছিল। এখন ওই খুবলে নেওয়া চোখ, বিকৃত মুখের দিকে অকস্মাৎ কারো অনভ্যাস দৃষ্টি পড়লে ভয়ে বিস্ময়ে মুহূর্তেক বোবা হয়ে যেতে হয়ই। কালো সোনার ডান হাত কব্জি পর্যন্ত উধাও। বাঁ-হাতে দুটো মাত্র আঙুল। বোমা বাঁধতে গিয়ে ফেটে এ রকম। তবু এই কাটা হাতে ভেলকি দেখাতে পারে। ছোটখাটো কাজকর্ম করে, সাইকেল চালায়। দুশমনির মোকাবিলায় হঠাৎ তীক্ষ্ণ ছুঁচলো কব্জির আঘাতে একটা দুটোকে ঘায়েল করে দিতে পারে।

ওদের এখন রাতজাগা কালচে বিধ্বস্ত চেহারা, ঘোরলাগা আবিষ্ট চোখ, মাথার চুল এলোমেলো বিশৃঙ্খল—তদুপরি কপালে টকটকে

গোলা সিঁদুরের তিলক, প্রত্যেকের, ট্যারা কালীরও, যা মুখাবয়বের উপস্থাপনে বিজাতীয় আদল দেয়। ওরা যখন কোন বড় কাজে নামে, একটা মার কৈলাশ ব্যাপার, তখন ললাটে এমন সিঁদুরের প্রলেপ দেয়।

গত বছর তার আগের বছর দুলুর ছেলেরা কালী পূজার ভাসানে ঘোড়ার মিছিল বের করল। পরের বছর ট্যারা কালী বের করল হাতির মিছিল। প্রথমেই দু-সারি হাতি, মাথায় শিরোপা, পিঠে ভেলভেটের ওপর পিতল জরির কাজ করা ঝালর। হাতির পর আলোর মিছিল, আলোর তোরণ, তোরণের মাঝখানে হাত-নাড়া মাথা-নাড়া দেবদেবী। তারপর বাজনা—ব্যাণ্ড, ব্যাক পাইপ, তাসা। সব শেষে প্রতিমা। এলাহি ব্যাপার, কয়েক ঘণ্টা রাস্তা বন্ধ, বাড়ির অলিন্দে ছাদে রাস্তার দুধারে উৎসুক মানুষের মুখ। সবার আগে হাতির পিঠে ট্যারা কালী কেয়ারি করা ঝকঝকে পিতলের সিংহাসনে বসা। তখনও ওর কপালে এমন সিঁদুরের তিলক ছিল।

জোলো তিনটে বোতলের একটা তুলে নেয়। নোক দিয়ে খুঁটে বোতলের মুখ থেকে গালার প্রলেপ সরায়। একটু চাপ দিতেই সোলার ছিপিটা বেরিয়ে আসে। বোতলের মুখে হাতের চেটো চেপে ধরে বোতল উপুড় করে। আবার বোতল নাবায়। হাতের চেটোয় লাগা সামান্য তরল আঙুল দিয়ে ঘসে চেটো নাকের সামনে ধরে গন্ধ নেয়।

থামস্ আপ বলে, 'আবে শালা এ তোর কুঁজি মাসির চুল্লু নয়। আসলি বাংলু। দে গুরুকে, পেরসাদি বানিয়ে দিক—'

জোলো বোতলটা ট্যারা কালীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'লাও গুরু মাল পিও, যুগ যুগ জিও!'

ট্যাংরা কালী বোতলের গলা মুঠোয় ধরে। ওর মুখের ভাব

এখন অনুত্তেজ স্থির। কোনো কিছুর মধ্যে আমূল লিপ্ত থেকেও নির্লিপ্ত থাকার যে এক রকম মার্গীয় দক্ষতা তা ওর আয়ত্ত। সেবার মনাকে ওদেরই দলের ছেলেকে দিয়ে ডেকে এনে খাল পাড়ে গলার নলিতে চাকু টেনে দিল এবং যখন মনার দেহটা ওর পায়ের সামনে পড়ে আছাড়-পাছাড়, তখন ওর মুখ ছিল আরো স্থির নির্বিকার, কঠিন পাথর যেমন।

ট্যারা কালী মুখ আসমান পানে তুলে মুখে বোতল উপুড় করে। বোতলের সাদা তরল গাল বেয়ে গলার গহ্বরে নেমে আসে। মুখ যখন ভর্তি ঘাড় নাবিয়ে নেয়। মুখের তরল আস্তে আস্তে পেটে চালান করে।

এখন ওকে ঘিরে পাঁচ জোড়া চোখ, চোখে নির্নিমেষ লোলুপ দৃষ্টি, ট্যারা কালীর মুখে লটকানো। ট্যারা কালী মুখের ওপর থেকে বোতল নামায়। দু-খেপে বোতলের অর্ধেক গায়েব। চোখ বুজে শেষ ঢোঁক গলা দিয়ে নাবিয়ে দেওয়ার কালে আয়েসি অনুভূতির অনুষঙ্গে বোতলটা সশব্দে তক্তার ওপর বসিয়ে দেয় এবং তখন গলা বেয়ে চাপা বেপরোয়া শিৎকার, যেন স্বত্ত উগরে দেওয়া ঢেঁকুর—'আলি, ফাঁড় দে দুশমনকা নালি—'

পাঁচ জোড়া চোখ, লোভি দৃষ্টি, হেলে এখন বোতলের গায়ে নিবদ্ধ। জোলো বোতলটা তুলে নেয়। তক্তার ওপর রাখা ভাঁড় হাতে হাতে ভাগ হয়, বোতলের তরল ভাঁড়ে, এবং ওরা ভাঁড়ের কানায় ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দেয়।

ট্যারা কালীর দু-হাঁটু মুড়ে পেট বুকের সমান্তরালে লগ্ন। দু-হাঁটুর মাঝখানে মুখ গোঁজা। এভাবে বসে উত্তেজক তরলের প্রতিক্রিয়া, দেহে ও মনে, উপলব্ধি নেয়।

ছোট খোকা বলে, 'বুঝলে গুরু, আর একটু দেরি হলেই শালা হয়ে যেতো লক আপকা আন্দার ফকাপ—'

ট্যারা কালী অনুরূপ ভঙ্গিতে বসে কাঁপা কাঁপা প্রান্তিক আলোয় তেরচা দৃষ্টিতে তাকায় ছোট খোকার দিকে। 'কেন—'

'দুলুর ছেলেরা ওঁত পেতেছিল লাস দখল দেবার জন্যে। আমি শালা খপর পেয়েই সোজা তোমার কাছে—'

ট্যারা কালীর অনুভূতিতে হঠাৎ করাতের দাঁতাল ঘর্ষণ, দু-চোখ যেন অন্ধকার গহিনতায় জ্বলন্ত ফসসরাস। গলার স্বর কটু ঝাঁঝাঁল! 'শালা দুলু, খানকির ছেলে, জান খতরা করে দেবো শালা। এক চুল্লিতে বারোটা লাস জ্বলত আজ।'

বাইরে এখন রাত্রির অন্তিম পর্ব। আকাশ শূন্যতা কালো আলখাল্লায় ঢাকা। স্বনন বাতাসের নির্বাধ উদ্দামতা। নদীর বুকে ঢেউয়ের আছড়ে-পড়া বেহায়া হাসি।

তখনও রাত্রি ছিল, তবে এমন নিথর পাথর নয়, যখন ওরা মৃত দেহটা নিয়ে শ্মশানে পৌঁছেছিল। তার আগে টানা তিন ঘণ্টা দেহটা খাটে শুইয়ে চারটে পাড়া অলিগলি ঘুরেছিল। মিছিলটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছিল, ওদের সঙ্গে পাড়ার উটকো-উৎসাহী ছেলে-ছোকরারা যোগ দেওয়ায়। তখন ওদের গলায় হরিধ্বনির উৎসারণ —'বল্‌লো হরি, হর্‌রি বোল—'। 'বল্‌লো হরি' ধ্বনিটা একজন তুলছিল, আর তার অনুরণনের জের ধরে সকলে বলে উঠছিল 'হর্‌রি বোল'। এই বলার মধ্যে আকর্ষণী ছন্দ ছিল, যে ছন্দের ছাঁচে কথাগুলির অর্থের বিশিষ্টতা গৌণ হয়ে পড়ছিল, এবং ছন্দের তালে তালে ওদের চলমান দেহ দুলছিল—এমন কি চার কাঁধের ওপর শায়িত মৃতদেহের মাথাটাও। তখন রাস্তায় চলমান অথবা জানালা অলিন্দে ঝুঁকে-পড়া মানুষের দৃষ্টি সম্পাতিত হয়েছিল সেই শবযাত্রার দিকে। সকলে দেখছিল, আগ্রহভরে অথবা স্বাভাবিক কৌতূহলে, একটি অনাথ মৃতদেহ নিয়ে সৎকার যাত্রা।

জোলো আর একটা বোতলের ছিপি খোলে। ট্যারা কালীর দিকে বাড়িয়ে, 'গুরু—'

ট্যারা কালী হাতের ইঙ্গিতে অসম্মতি জানায়। 'পরে. তোরা খা।'

বোতলের তরল প্রত্যেকের ভাঁড়ে ভাগ হয়। ট্যারা কালী এক সময় মুখ তোলে, 'হ্যাঁরে, ঐ মাগিটা, বুড়ি, কে ?'

ছোট খোকা বলে, 'যে তোমার এখানটা ধরে বাওয়াল করছিল—বাবারা আমার রাজার ছেলে সোনার চাঁদ ! তোমরা যা করলে, ভগমান তোমাদের সুকে রাখুক, ইয়ে করুক—ঐ বেধবা মেয়ে ছেলেটা তো ? নগেন মিত্তিরের বোন।'

'মাল-ঝাল ছাড়ে নি কিছু ?'

'মাল ছাড়বে থোড়ি। শালা ফুকো পার্টি। বহুৎ স্যায়না ! আমাদের থেকে খেঁচার ধান্দা।'

প্রান্তিক আলোর ছায়া-আবছায়ায় ওদের অবস্থান, ক্রিয়াকলাপ ভাবভঙ্গিতে পিশাচগ্রস্ততা। মোমের শিখার কম্পনে ওদের দেহে আলোছায়া দোলে। দেহের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টি ঘোলাটে কিন্তু বেপরোয়া।

···উদ্দেশ্য তো ছিলই, নতুবা কেন লাস দখল দেয়া, কেনবা নগেন মিত্তিরের দেহ কাঁধে নিয়ে তিনটে পাড়া ঘুরে এখন শ্মশানে রাত্রি গাহন।

দ্বিতীয় বোতল বখরার পর আর যখন চার আঙুল পরিমাণ অবশিষ্ট তখন ট্যারা কালী বোতলটা হাতে তুলে নেয়। তরল গলায় ঢেলে বোতল নামিয়ে রাখে। বাঁ চেটোয় ঠোঁট মুছে থামস্ আপের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কত আছে আর ?'

'কি ?'

ট্যারা কালী বুড়ো আঙুল পরের আঙুলের ডগায় ঠেকিয়ে টুসকি মেরে বলে 'রেস্তোঁ—'

'চল্লিশ টাকা মতন।'

'ব্যস? আর কি হল? সটকেচিস?'

'যাঃ-চ্চোলে। খরচ হল না। উঠেছে তো চারশ টাকা মতন, রোডের দোকানগুলো থেকে যা তুলেচি। খাট, ফুল, কাপড় আরো সবকিছু কিনতে হল। তারপর কীত্তনীয়া পার্টি, শ্মশান খরচ, এই মালের বোতল। ফুল খাটেই তো দেড়শ টাকা নিকেশ—'

'অ্যাঁ শালা যেন গন ফট লাট সায়েবের ফাদার। ফুল খাট কিনতে দেড়শ টাকা!'

থামস্ আপ হাসে—গভীর নৈকষ্য, শেয়ালের কাশির মতো, পারিবেশিক স্বাতন্ত্র্যে যা ভিন্ন তাৎপর্য আরোপ করে। 'ভালো চার ছড়ালে তবে না উঠে আসবে বড় বড়!'

ট্যারা কালীর দৃষ্টি থামস্ আপের মুখের ওপর—স্থির, সটান। সে দৃষ্টি মনে কোন প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি, বোঝা দুরূহ। 'দে পাত্তি ছাড়—'

থামস্ আপ পকেট থেকে নোট আর খুচরো বের করে বাড়িয়ে দেয়। ট্যারা কালী কয়েকটা নোট, সাকুল্যে কুড়ি টাকা, নিজের পকেটে রাখে। বাকি ফেরত দেয়। 'তোদের হিস্যা, বখরা করে নিবি, বরাবর।'

দেড় ব্যাটারি বলে, 'গুরু কাল থেকেই তাহলে রোডে বেরিয়ে পড়ব?'

'না। পরশু থেকে ' কাল রেস। বাড়ি বাড়ি যাবি, যেখানে আমরা লাস নিয়ে ঘুরলাম, পাঁচ পাবলিকের কাছে। পয়সা থাকবে ছোট খোকার জিম্মায়।'

জোলো তৃতীয় বোতলের গলা মুঠোয় ধরে মুখের সামনে নিয়ে আসে এবং বোতলের গায়ে সপ্রেম চুমো দিতে দিতে আলুলায়িত স্বরে বলে, 'জয় কালী কলকাত্তাআলী, মাল পিয়ে হালি হালি—' এবং

বোতলের ছিপি খোলে। আবার ভাঁড়ের মুখে বোতল উপুড় করে বখরা হয়। ঠোঁটের স্পর্শে তরল গলায় নামে।

সারা দিনের পরিশ্রমে, পথ ভাঙার ক্লান্তিতে শরীর যখন আড়ষ্ট নাজেহাল, তখন তরলের প্রতিক্রিয়া দেহে মনে ভিন্নতর আমেজ আনে। ঢুলুঢুলু চোখে তাকায় একে অপরের দিকে। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে হেসে ওঠে, খিস্তি করে। ট্যারা কালী নৌকার খোলের ভেতর মাথার নিচে হাত রেখে আড়াআড়ি শুয়ে পড়ে। নৌকার খোল দু-দিক থেকে মাঝখান বরাবর ঢালু নেমে আসায় ট্যারা কালীর দেহ বেঁকে ধনুকের আকার নেয়। কালো সোনা জড়ানো গলায় হেঁচকি টানে গান ধরে 'ও মা বোতলেশ্বরী, তোর পায়ে মা পেনাম করি…'। দেড় ব্যাটারি থ্যাঁতলানো গাল আর মাড়ি ছড়িয়ে খিক্ খিক্ শব্দে হেসে ওঠে। ছোট খোকা বলে 'সোনা, শালা, পুরো আউট—'

'চোপ শালা, আউট থোড়ি। হাম তো পুরা হুঁশমে।'

'সাচ? বোল তো তেরা পা'র ক্যা নিচে ক্যা?'

'আসমান।'

'শির ক্যা উপ্‌পর?'

'ধরতি—'

ট্যারা কালী হঠাৎ কালো সোনাকে লক্ষ্য করে পা ছুঁড়ে দেয়। এবং কালো সোনা তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে ছিটকে যায়, যেনবা ব্যাঙ, ব্যাঙের মতোই দেহটাকে সংকুচিত করে—ভারি লাথিটা গায়ে লাগার আগেই, যা দেখে সকলে হেসে ওঠে এক সঙ্গে।

'দেখা তো ম্যায় পুরা হুঁশমে!' কালো সোনাও হাসে।

ওরা এক সময়ে ওঠে গতর ঝাড়া দিয়ে। নৌকার গর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে চোখ কচলে তাকায়। নদীর পৃষ্ঠোপরি আকাশ শূন্যতায় তখন প্রথম প্রত্যুষের ছোঁয়া, যে কারণে রঙ ঘোলাটে, ঘষা আধুলির

মতো—যেনবা ক্যানভাসের গায়ে হালকা জল রঙের স্পর্শ, যখন এমনতর পটভূমিতে নদীর ওপারে সারিবদ্ধ গাছের দেয়াল, গাঢ় কালো রঙে মোটা বলিষ্ঠ টানের মতো।

নদীর পাড় ছেড়ে ওরা ওপরে উঠে আসে। রাস্তা পার হয়ে শ্মশানের ভেতর ঢোকে। চিতা এখন নির্বাপিত, পোড়া কাঠ আর অঙ্গারের স্তূপে, যেখানে সকলে জল ঢালে, শ্মশানযাত্রীরা—চিতা শীতল করার অভিপ্রায়ে। শ্মশান চত্বরের এক পাশে, শিউলি ঝোপের নিচে ছেলেটি, বয়স বছর দশ-বারোর, দাঁড়িয়ে, করুণ অবোধ দুই চোখে স্থির দৃষ্টি মেলে। বালকটি মৃত নগেন মিত্তিরের অনাথ উত্তরাধিকার। শ্মশানযাত্রীরা একে একে চিতাগর্ভে মাটির ঘড়া উপুড় করে জল ঢালছিল আর জল ঢালার কালে চিতাগর্ভ থেকে উত্থিত ভস্ম আর বাষ্প বাতাসে পাক খেয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তখন নিয়ম পালনের দায়ে, শ্মশানযাত্রীদের কয়েকজন, শিথিল বিলম্বিত স্বরে বলে যায়, 'বলো হরি, হরি বো-ও-ও-ল—'

দ্বিতীয় দিন থেকে ওরা বের হয়। পাড়া, গলি, লেন, বাইলেনে ঘোরে। ঘরে ঘরে যায়। 'দাদা, আমরা এসেচি…হ্যাঁ, মাসিমা, ঐ যে নগেন মিত্তির, মারা গেল—কেউ নেই তো দেখার। তা আমাদের পাড়াপতিবেশী, তাই মানে একটা কত্তব্য-টত্তব্য…বৌদি, কত দিচ্ছেন, না না এত কমে কি করে হয় বলুন, একটা ছাদ্দের খরচ, এই বাজারে বুঝলেন তো—আপনার একান্ন টাকা ধরেচি, হবে হবে দেখুন…'

স্বর্ণময়ী লেনের তিন নম্বর বাড়িটায় ঢোকার আগে থামস্ আপ পকেট থেকে চিরুনি বের করে তেড়ি বাগিয়ে নেয়, জামার আস্তিন গোটায় ভালো করে, রুমালে মুখ মোছে। ছোট খোকা বলে, 'ভেতরে গিয়ে বাওয়াল করবে না বলে দিচ্চি।'

কথাটা থামস্ আপ কানে নেয় না। নিজেই আগে ঢোকে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে তল্লাসী দৃষ্টিতে চারদিক দেখে, এবং দেখতে দেখতে 'মাসীমা কোথা—' বলে বারান্দায় উঠে দরজার সামনে দাঁড়ায়। একটি মাঝ বয়সী মহিলা বেরিয়ে আসেন। থামস্‌ আপ কথাগুলো, যা বহুবার বলতে বলতে এখন কণ্ঠস্থপ্রায়, প্রতিটি অক্ষরও, মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে বলে, যদিও পরোক্ষে অন্য আর একজনকে শোনানোর ইচ্ছা—দেখারও, কিন্তু দেখা পায় না।

বাইরে বেরিয়ে আসলে দেড় ব্যাটারি থ্যাবড়ানো দাঁত আর ঠোঁট বিকশিত করে হাসে, 'চিড়িরা ভাগল্‌বা—'

'কি নাম রে' জোলো বলে।

'রত্না, ডাক নাম কটকটি।'

'আঃহাঃ মরে যাই!'

'আর দেখলে না—যখন এমনি করে হেলে হেলে দুলে দুলে যায় মাইরি, বুক জ্বলি যায়, জ্বলি যায়—'

ছোট খোকা শাসায়। 'তোরা বাড়ি ঢুকে বাওয়াল করবি না তো, ভদ্দর লোকের বাড়ি—'

'ভদ্দরলোক? থোড়ি!' জোলো বলে, 'দেড়া, সেই চুটকিটা ছাড় তো—'

দেড় ব্যাটারি খ্যাকারি দিয়ে গলা সাফ করে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় সুরু করে বলে, 'ভদ্দর লোকের তিনটে দোষ, কাশে পাদে করে রোষ!'

ছোট খোকা হাসে, এবং হাসতে দেড় ব্যাটারির পেছনে একটা লাথি কষায়। তখন দেড় ব্যাটারিও হেসে ওঠে, পেট থেকে উগরে দেওয়া বমনের মতোই যা কটু—এবং অন্য সকলে, পাঁচজনে, আড়া-আড়ি রাস্তা জুড়ে বিটকেল ভঙ্গি ও শব্দে—যখন কিছু পথচারী মানুষজন সংক্রামণ ভয়ে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যাওয়ায় তৎপর।

শালিমার এক নম্বর গো-ডাউনের বগলে লালমোহনের দোকানে

ওদের ঠেক। হাইওয়ের নিচেই দোকান। চা-ঘুগনি-পাঁউরুটির। যদিও এটা আপাত্ত, অন্দরে হরেক নিষিদ্ধ খাদ্যের যোগান, কাজ-কারবার লেনদেন চলে। সকালে নগেন মিত্তিরের বোন আসে, যখন ট্যারা কালীর সাকরেদরা বেঞ্চিতে আসর জমিয়ে বসে। বৃদ্ধার চেহারা কালের অবক্ষয়ে শুষ্ক ভঙ্গুর শাখা-কাষ্ঠ যেমন। ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আকুতিভরা স্বরে বলে 'বাবারা, মেয়েটা বাঁচবে না গো—'

'কে ?' নির্দোষ ব্যগ্রতায় জিজ্ঞাস করে ছোট খোকা।

'আমার ভাই-বৌ। যন্তরনায় আকুলি-বিকুলি। তিনদিন ঘুম নেই। কথা বলতে পারে না। কারোকে চিনতে পারে না বাবারা।'

'ইস তাই নাকি।' জলোর কণ্ঠে কৃত্রিম বেদনা।

'হ্যাঁ বাবারা, তোমরা একটা না ব্যবস্থা করলে ··'

বৃদ্ধার মুখের ওপর থেকে মাথা নামিয়ে ওরা এ-ওর দিকে তাকায়। দেড় ব্যাটারি ফ্যাসফ্যেসে গলায় বলে, 'মরে গেলে খপর দেবেন, ব্যবস্থা করব।'

বৃদ্ধা ওর কথার অর্থ অনুধাবন না করতে পেরে হকচকিয়ে যায়। একটু থেমে বলে 'তোমরা যদি একবার যাও, কিছু চিকিচ্ছা পত্তরের জন্য কিছু করো···'

'হবে। আপনি আমাদের কালীদা, গুরু, কাল সন্ধেবেলা আসবে—ওকে ধরুন সব কিছু হবে।'

শ্রাদ্ধের তিনদিন আগে ট্যারা কালী সাকরেদদের সঙ্গে পাড়ায় বের হয়, কিছু বিশেষ জায়গায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে হাজিরা দিতে। ফরসোর রোডের মুখে রাম দেনির গো-ডাউন—আলু, পেঁয়াজ, ডালের। ঢুকতে ফটকের দুই দিকে তোরণস্তম্ভে গোড়ুর মূর্তি—কংক্রিটের, করজোড়ে, ডানা প্রসারিত। ফটক পার হয়ে গুদামের সেড, সামনে কয়েকটা ট্রাক দাঁড় করা। বাঁ-দিকে বিশাল মোকামের এক তলায় রাম দেনির গদ্দি। উঁচু তাকিয়ার ওপর

রাম দেনির উপবেশন। ওর আয়েসি পরিপুষ্ট শরীরে মলমলের পাঞ্জাবি, বাম কানের গর্তে আতরসিক্ত তুলো, শক্ত চোয়াল, দীর্ঘ মোটা এক জোড়া গোঁফ ঠোঁটের দুদিকে চিবুকের দুই কোল পর্যন্ত প্রসারিত। রাম দেনির সামনে একটি যুবক দণ্ডায়মান, শরীরে যার দেহাতি বলিষ্ঠতা—রাম দেনির আক্রমণের মুখে বিপর্যস্ত বেয়াকুফ। '...ক্যা শালে টিরাক তেরা বাপকা—সালে উল্লু ক্যা পাঠ্‌টে। কুচ নোকসান হো যাতা তো ? টিরাক ছোড়কে চলে আয়ি, শুয়ার ক্যা আওলাদ—'

প্রবেশদ্বারের চৌকাঠে মাথার ওপর সুতোয় ঝোলান পাতিলেবু, কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। ভেতরে ঢোকার কালে ট্যারা কালী মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলে 'জয় হো রামজী কি !' রাম দেনি দৃষ্টি সামান্য সরিয়ে ট্যারা কালীকে গোচরে আনে, এবং মাথার আলতো হাত ঠেকিয়ে বলে, 'জয় হো'—যদিও ট্যারা কালীর উপস্থিতি ওর মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বোঝা যায় না। ট্যারা কালী ভেতরে ঢুকে গদির একপাশে বসে। ওর ছেলেরা ঘরের ভেতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়ায়। রাম দেনি আরো কিছুক্ষণ সামনে দণ্ডায়মান লোকটাকে গুরু শ্লেষে বিদ্ধ করার পর বলে, 'বত্‌তমিজ, ভাক শালে হিঁয়াসে—'

লোকটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে। একতরফা উত্তেজনার জের প্রশমনে রাম দেনি তাকিয়ার ওপর কয়েক বার শরীরের ভার বদল করে। ট্যারা কালী বলে, 'শেঠজী হাম তো আয়া আপকা পাশ—'

'বোলিয়ে ক্যা বাত।'

'কুচ রুপেয়া—'

'কিঁউ—' রাম দেনির স্বরগ্রাম হঠাৎ চড়ে যায়, বাঁ-দিকের গোঁফ ঝুলে পড়ে। 'তুমারা হিস্যা তো ভেজ দিয়া।'

হিস্যা, মাসিক বন্দোবস্ত, রাম দেনির সঙ্গে ট্যারা কালীর। একবার শালিমার গো-ডাউন থেকে লোড করা রাম দেনির চারটে ট্রাক আটকে দিয়েছিল ট্যারা কালীর ছেলেরা। পেঁয়াজ, আলুর বস্তা সরিয়ে পিতল, তামার বার টেনে বের করেছিল। সেই থেকে ট্যারা কালীর সঙ্গে রাম দেনির হিস্যার বন্দোবস্ত, পাক্‌কা ইন্তেজাম।

'নেহি জী, হিস্যা কে লিয়ে আয়া ম্যায় থোড়িই। ওতো আপ খুদই ভেজ দিয়া। হাম তো আয়া কুচ দুসরা ফিকির মে। ও যো মর চুকা, এক আদমী, পড়শী ক্যা, হাম সব মিলকে দফন কিয়া। আভি তো উসকা শ্রাধ্‌ করনা হ্যায়। দেখ ভাল করনেআলা তো কই নেহি, তো হামলোগ পাঁচ আদমি মিলকে···আপকো ভি দেনা হোগা—'

মন্দিরতলার মোড়ে গিরিশ দত্তের বাড়ি। গিরিশ দত্ত রাজনীতি করেন, এক্স এম এল এ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও। গিরিশ-বাবুর বাড়িটা পৈত্রিক আমলের—সেকেলে জমকালো। চার ধারে পান-সুপারির বেড় দেওয়া। কেয়ারি করা লোহার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল টিপতে ভেতরে কুকুরের ডাক, যখন একটি মহিলা, অল্প বয়সী, গায়ের রং কালো, কিন্তু আঁটসাঁট ভরাট চেহারা—বেরিয়ে আসে। বেলিলিয়াস রোডে গিরিশ দত্তর মোল্ডিং-এর কারখানা। মেয়ে বিয়ের পর আমেরিকাবাসী, ছেলের পুরুলিয়া মিশন স্কুলে পড়াশোনা এবং থাকা। স্ত্রী প্যারালাইজড। গিরিশ দত্তর আমদানি সরেশ। ট্যারা কালীর থির লালচ দৃষ্টি মেয়েটির দেহ লেহন করে। মেয়েটির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে ট্যারা কালী বলে, 'গিরিশদা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ডেকে দাও তো। বলো কালীবাবু ডাকছে।'

মেয়েটি চলে যায়। ওরা গেট পার হয়ে ভেতরে ঢোকে। কয়েক মিনিট পর গিরিশ দত্ত পায়ে চটির আওয়াজ তুলে বেরিয়ে আসেন। গিরিশ দত্তর গায়ে ট্রাউজার। ট্রাউজারের ওপর চওড়া ফেল্ট। চেহারা ও পোশাকে সাহেবি বাঙালিয়ানার দোআঁশলা আভিজাত্য।

'কি, কালী, তুই—'

'এই এলাম, দেখা করতে তোমার সঙ্গে।'

'কি ব্যাপার ?'

'ব্যাপার, মানে, আমাদের পাড়ায় নগেন মিত্তির মারা গেচে তো। আমরা পাঁচজনে মিলে ছাদ্দছাত্তি করচি। পরশু কাজ। যেতে হবে।'

গিরিশ দত্ত ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হাসেন। 'তুই কি আজকাল এই লাইনে ভিড়েছিস ?'

'বাজার বহুত জ্যাম।'

গিরিশ দত্ত হঠাৎ গুম খেয়ে যান। গলার স্বর পালটে বলেন, 'কালী, তুই ঘরে গিয়ে বোস। কথা আছে—' গিরিশ দত্ত ভেতরে চলে যান। ট্যারা কালী বারান্দাটা পার হয়ে ডান হাতি ঘরটায় ঢোকে। ওর সাকরেদরা দাঁড়িয়ে থাকে বাইরে।

প্রায় সজ্জাবর্জিত ঘরটা—টেবিল চেয়ার, একটা সোফা, কিছু বইপত্তর ও দেয়াল ঘড়ি ব্যতিরেকে—গিরিশ দত্তের ড্রয়িং রুম। দেয়ালে কয়েকটা ছবি, গিরিশ দত্তের অ্যাকশন মুড—মাইকের সামনে, আলোচনার টেবিলে, জনতাকে পেছনে নিয়ে—ফটো স্টিলে ধরা। ট্যারা কালী সোফাটাতে বসে।

গিরিশ দত্ত ঘরে ঢোকেন। চেয়ারটাতে বসেন। সরাসরি ট্যারা কালীর চোখে চোখ রেখে বলেন, 'তোর আজকাল কি ব্যাপার বলত কালী ?'

'কেন বস্—'

'হরিপদর পার্টির সঙ্গে তোর খুব মাখামাখি।'

'না, মানে, ওরা এখন পাওয়ার পার্টি, তাই একটু আধটু···'

'ফালতু বকিস না—' গিরিশ দত্তর গলা হঠাৎ চড়ে যায়। 'ইলেকশনে তুই আমার এগেন্‌স্টে ওর হয়ে কাজ করিস নি?'

'না বস্‌, দলের দু-একটা ছেলে · '

'চোপ শালা, লোচ্চা কুত্তির ছা—' ক্ষিপ্ত হুংকারে ফেটে পড়েন গিরিশ দত্ত। ট্যারা কালীর শিরদাঁড়া তখন চকিতে টানটান, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, এবং আক্রমণী অনুভূতিগুলো হঠাৎ ঝলকে ওঠে, খাপ খোলা ছুরি যেমন।

'শালা বেইমান। মনে নেই, যখন তুলে নিয়ে গেছিল ঘর থেকে, আমি না থাকলে তিনটে কেস পুরে দিত পেছনে। ইমার্জেন্সি, মিসায় লটকে দিত। আর সেই তুই, আমার সঙ্গে বি-কেলাসি করে হরিপদ মারাচ্ছ শালা...'

গিরিশ দত্তর গাল, চোখ-চিবুকের কোলে থলথলে মাংস ঝুলে যায় যখন উনি রেগে যান, এবং তখন গলার স্বরে ঘড় ঘড় শব্দ, জান্তব নির্ঘোষ যেমন। গিরিশ দত্তর বিষ ভেতরে, এবং বাইরেও। ট্যারা কালী ভয় পায়।

নগেন মিত্তিরের বোনের নাছোড় পীড়াপীড়িতে এবং নিজের কিছু গুহ্য অভিপ্রায়ে, অবশেষে ট্যারা কালী যায়, নগেন মিত্তিরের স্ত্রীকে দেখতে। জীর্ণ ভাঙাচোরা বাড়ি, দেয়ালে নোনা ধরা ইট দাঁত বের করা, রুগ্নভগ্ন হাড় জিরজিরে পাঁজরার মতো। ভাঙা দরমার বেড়া সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ডানহাতি সিমেন্টের বেদি মতো, নিচে খুপরি পরিসরে একটা রোগা নেড়ি কুত্তি শুয়ে এবং কুত্তির কোল জুড়ে এক গাদা বাচ্চা। কুকুরটা কর্কশ সতর্ক দৃষ্টি মেলে আগন্তুকদের অভিসন্ধি জরিপ নেয়। বাড়িটা পাকা, কিন্তু দীর্ঘদিনের অযত্ন

অবহেলায় এখন জীর্ণ দীন-হীন। উঠোন জুড়ে স্বত গজিয়ে ওঠা বুনো গাছ-আগাছা। বারান্দায় উঠে নগেন মিত্তিরের বোন দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢোকে। পেছনে ট্যারা কালী। ঘরের বদ্ধতায় গুমোট ভ্যাপসা গন্ধ। দরজা টপকানো আলোয় ঘরের নিকষ অন্ধকার অংশত ফ্যাকাসে, এবং সেই তরলিত অন্ধকারে, আলো-আবছায়ার প্রত্যন্তে একটি দেহ, খাটে শায়িত, আপাদবক্ষ চাদরে ঢাকা, যদিও অনুধাবন করা দুরূহ একটি মানুষ, তদুপরি একটি মহিলা শয্যালগ্ন কি না, না-যদি এলোচুলের ঝাঁক শয্যা বিস্তার করে থাকত—দেহটা এত কৃশ ও শয্যালীন।

নগেন মিত্তিরের বোন এগিয়ে গিয়ে খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকে, 'বৌ, এই বৌ…'। কাত হয়ে পড়ে থাকা দেহটিতে কোন সাড় নেই। আরো কয়েকবার ডাকার পর ক্ষীণ বেদনার্ত শিৎকার সহ আস্তে আস্তে মুখ সোজা হয়। মুখটা, মানুষের, তদুপরি জীবন্ত, কিন্তু এতই শুষ্ক শীর্ণ যে, মরা মানুষের করোটি-সদৃশ। চোখ দুটো আঁখি-কোটরের গভীর গর্তে। বাহ্যিক কোনো কিছুই, মৃত্যুর করাল ছায়াছন্ন দৃষ্টির উপলব্ধিতে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে না। মৃত্যু, বাঁচা আর মরার চরম ধস্তাধস্তির সন্ধিক্ষণে, ভূপরি আছড়ে পড়ার আগে ঝড়ের সঙ্গে অসম যুদ্ধে ব্যাপৃত কোনো মহীরূহের মতো—দেখেছে ট্যারা কালী। সে তো বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর মৃত্যুর অমোঘ থাবার টানাপোড়েন। কিন্তু মৃত্যুর সামনে এমন অক্ষম আত্মসমর্পণ—নিজের বোধ, চেতনা, অস্তিত্বের—দেখে নি। মরণোন্মুখ মহিলাটির দিকে ট্যারা কালী বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, ভয় পায়। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

শ্রাদ্ধের তোড়জোড়ে গাছ-আগাছা কেটে নগেন মিত্তিরের বাড়ির উঠোন পরিষ্কার করা হয়। উঠোনে ত্রিপলের ছাউনি পড়ে। এক

ধারে ভেন-ঘর বসে। সাড়ম্বর আয়োজন। কালো সোনা বলেছিল, 'গুরু, একটা মাইক-ফাইক—'

খেঁকিয়ে উঠেছিল ট্যারা কালী, 'শালা মাইক! পাবলিককে পেছনে পুরে দেবে।'

সন্ধ্যা উৎরানোর মুখে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেন। পাড়ার মান্যজনরাও। ট্যারা কালীর ছেলেরাও ব্যস্ত হয়ে ওঠে অতিথি নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে। আর সেই জমজমাট আয়োজনের মধ্যে যার পিতৃকর্ম, সেই বালকটি অনাবশ্যক উদ্বৃত্তের মতো কোথায় যে হারিয়ে যায়, কেউ খবর করার প্রয়োজন মনে করে না। ডাঃ সুরেশ চৌধুরী, যাঁর ই এস আই কার্ডধারী রোগী শ-পাঁচেক—সকালে দেখেন, দুপুরে শিবপুরে একটা পার্টনারশিপ নার্সিংহোমে এটেণ্ড দিতে হয়, এবং রাত্রে প্রাইভেট প্রাকটিস—তিনি আসেন। অধ্যাপক নীলমণি কানুনগো—সকালে একটা মেয়ে কলেজে পার্ট টাইমার, দুপুরে ফুল টাইম একটা ছেলে কলেজে এবং সন্ধ্যার পর সপ্তাহে চার-ছ ঘণ্টা হিসাবে প্রাইভেট পড়ান—তিনিও। শালিমার থানার ছোট দারোগা সিভিল ড্রেসে জিপ নিয়ে চক্কর দিয়ে যান। গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন হাউসিং বোর্ডের কনট্রাক্টর শ্রীনিবাস বৈদ্য। গিরিশ দত্তও পৌঁছে যান সময় মতো। উঠোনে ছাউনির নিচে সকলে বসেন চেয়ার পেতে। এবং পারস্পরিক খুচরো কথা, বার্তা বিনিময় আলাপ-চারিতার মধ্যে দিয়ে স্বত পৌঁছে যান এক রকম নস্টালজিক অবস্থানে।

'...আমাদের সময়ে বুঝলেন তো, একটা সোস্যাল ইনভল্ভমেন্ট সোস্যাল রিলেশন ছিল। আর আজকালকার ছেলেছোকরারা সব কিছুর প্রতি কি রকম এ্যালিইনেট।'

'আরে মশায় পাড়ার একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করুন, তার নেইবারের একটা নাম। বলতেই পারবে না। অথচ আমাদের

সময় পাড়া-প্রতিবেশী কে বিপদে পড়েছে, পয়সার অভাবে কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কার চিকিৎসা হচ্ছে না, শুনলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছি।'

'ছেচল্লিশের ডিভাস্টেশন, মনে আছে নিশ্চয়, তখনো ছাত্র, রাজনীতির টাচে আসি নি—ঝাঁপিয়ে পড়লাম ত্রাণকাজে। এক বছর পরীক্ষা দেওয়াই হল না।'

'আজকের জেনারেশনের এই এ্যালিনেশন, এটা তো সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। সোস্যাল কোহিসন ইন্টিগ্রেসন ব্যাহত করে।'

'বটেই তো, ইয়াং জেনারেশন হল, কি বলে, ব্যাক বোন অব দ্য নেশন!'

'আসলে রিসেশন অব দ্যা হিউম্যান ফিলিং!'

'সেই সঙ্গে ডিটোরেশন অব দ্যা মরালিটি, ভ্যালুজ অ্যাণ্ড কনসাশনেশ '

'রাইট!'

হঠাৎ চাপা গোঙানি শব্দে ওদের জমে ওঠা আলোচনা ব্যাহত হয়। মনস্কতা বদলে সকলে শব্দটার উৎস আবিষ্কারে চেষ্টা করে। শব্দটা ক্ষীণ থেমে থেমে কিন্তু লাগাতার, এবং এতই তীক্ষ্ণ ও করুণ যে, এই মানুষজন ব্যস্ততা কথোপকথনের উৎসবী পরিপ্রেক্ষিতেও স্বতন্ত্র অবয়বে অবধারিত মন স্পর্শ করে। শব্দটা সঙ্গমেচ্ছু বেড়াল-বেড়ালির শৃঙ্গার ধ্বনি অথবা বেদনায় ধ্বস্ত মৃত্যুচল কোনো মানুষের কাতরানির অনুরূপ। গিরিশ দত্ত ইসারায় ট্যারা কালীকে ডাকেন। কাছে আসলে ইঙ্গিতে শব্দটা ওর উপলব্ধিতে এনে প্রশ্ন করেন, 'কালী ব্যাপার কি?'

ট্যারা কালী বারান্দার ওপর আধ ভেজানো দরজাটার দিকে তাকায়,

যার অভ্যন্তরে অন্ধকার, এবং অন্ধকার প্রত্যন্তে নগেন মিত্তিরের স্ত্রী—রুগ্ন, শীর্ণ, শয্যালীন।

'ও কিছু নয়' বলে ট্যারা কালী চলে আসে। সামনে ছোট খোকাকে পেয়ে চুপি চুপি কিছু বলে। ছোট খোকা বারান্দার ওপর উঠে দরজাটা টেনে শেকল তুলে দেয়। করুণ গোঙানি আর কানে পৌঁছায় না।

লালমোহনের দোকানে কয়েকদিন ওদের আর ঠেক পড়ে না। ট্যারা কালী পুরানো মো-বাইকটা সারিয়ে টাউন তোলপাড় করে বেড়ায়। সকলের গায়ে নতুন জামা-প্যান্ট ওঠে। ঠোঁটে ঝোলে দামী সিগারেট। রাতে বিলিতি খেয়ে মৌজ করে। সপ্তাহখানেক দেদার ফুর্তি লুটে একে একে আবার ফিরে আসে লালমোহনের ঠেকে।

কদিন পর ওরা সকালে টেবিলে রেখে যাওয়া লালমোহনের তিনটে চা ভাঁড়ে ঢেলে ছটা করছে, এমন সময় কালো সোনা যেন পেটোর ছর্‌রা, এমনই আচমকা ছিটকে ঢুকে পড়ে দোকানে—'লগেন মিত্তিরের বৌ গন ফট—'

খবরটা, রেসের মাঠে টি টি অথবা জ্যাকপট জিতে নেওয়া, কিংবা সাট্টায় পাত্তিসে ফিগার মাৎ করার অনুরূপ সুখকর, যা ওদের মনে ত্বরিৎ উল্লাস সঞ্চার করে এবং চোখগুলো ওঠে চকচকিয়ে। 'কখন মল্লো ?'

'রাত্তিরে হবে। সকালে যাচ্ছিলাম, দেখি বুড়িটা কাঁচ্ছে। উঁকি মেরে দেখেই এক দৌড়ে এখেনে।'

'ল্লে শাল্লা, লক আপ ক্যা আন্দার ফকাপ'—স্ফূর্তিতে চিৎকার করে ওঠে ছোট খোকা।

থামস্ আপ কোমর তুলিয়ে গেয়ে ওঠে, 'নাচ মেরে জান—ফটা-ফট্-ফট্—'

দেড় ব্যাটারি বলে, 'গুরুকে খপর দে, জলদি, লাস দখল দিতে হবে—'

অশুভ উল্কার মতো ছিটকে ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে যায়।